চ তু র্থ অ ধ্যা য়

মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ : আধুনিক বাংলা কবিতা

সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। কবিতার সৃজনবিশ্বের প্রতি এমন একটা অত্যন্ত লক্ষ্যভেদী মন্তব্য করেছিলেন কবি জীবনানন্দ। কবি হতে গেলে প্রথমত হওয়া দরকার উত্তম পাঠক। একই সঙ্গে হতে হবে সচেতন পাঠক। একমাত্র সচেতন পাঠকই দেখাতে পারেন পরিগ্রহণে পরিমিতি বোধ, সৃজনের সপ্তস্বরায় আত্মসংবরণের সংযম। এটা না হলে কবিতা হয়ে পড়বে বাঁধনছাড়া অসংযমের মাত্রাহীন উচ্ছ্বাস। মনে রাখা দরকার কবি যা লিখবেন, তা আসলে তাঁর বক্তব্য-চিহ্নের চিহ্নায়িত রূপ। দেরিদা উচ্চারণ করছেন অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য :

> spoken words (ta en te phone) and written
> words are the symbols of spoken words.[১]

কবিতার বয়ানে বিষয়ীর গুরুত্ব কমে বিষয়ের গুরুত্ব অনেক দিন আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়ের অভিনবত্ব নিয়ে বিতর্কের শেষ হয়নি। কী করলে বা কীভাবে করলে আজকের কবিতা সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে, সেই সাহিত্যিক টেক্সটচারের উপস্থাপনলগ্ন বিতর্ক সহজে শেষ হবেও না। আমরা এর সমাধানে উপনীত হওয়ার জন্যে এই গবেষণায় অধিক সময় ব্যয় করতে পারব না গবেষণার অভিমুখের কারণেই। তবু একথা আমাদের উচ্চারণ করতেই হবে, আজকের কবিতার বিষয়গত মুক্তি সম্ভব পরিগ্রহণে। নতুন ভাবনার খোঁজে আকাশ বাতাস হাতড়ে বেড়ানো নয়, পুরাতন বিষয়ের মধ্যে ঘটাতে হবে অর্থগত সৃজনশীল অন্তর্ঘাত। ঐতিহ্যের চালচিত্রে খুঁজতে হবে অধুনান্তিক কবিতার মুক্তি। তবে আমরা কোথাও একথা বলছি না, পরিগ্রহণের নামে আমরা পুরাতনের অনুবর্তনের পক্ষে সওয়াল করছি। একালে দাঁড়িয়ে কেউ মঙ্গলকাব্য লিখবেন না, মহাকাব্যও লিখবেন না। সেটা উচিৎ নয়, সম্ভবও নয়। কিন্তু সেই মঙ্গলকাব্য বা মহাকাব্য, যা যুগের সীমা অতিক্রম করেও সমাদৃত হচ্ছে আজও, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কালোত্তীর্ণ মহিমা যে ছিল, তা

অনুভব করতেই হবে। সেই শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে পূর্বজ মহান স্রষ্টাদের সৃজন পাঠ করতে থাকলেই একালের সচেতন পাঠক-স্রষ্টা অনুধাবন করতে পারবেন সেই সমস্ত পাঠের উপরিতলের অর্থ, যাকে কেন্দ্রীয় অর্থ বলা যেতে পারে, তার শাসন অস্বীকার করলে এমন অনেক নীরব অর্থের এলাকা দৃষ্টিগোচর হবে যা অদৃষ্টপূর্ব। সেগুলিকে মুক্ত করতে পারলে পরিগ্রহণের সার্থকতা সিক্ত করবে একালের কবিতাকে। বিনির্মাণের প্রয়োজন সেখানেই।

সেই দিকে অনুধ্যান রেখে আমরা আধুনিক বাংলা কবিতায় মনসামঙ্গলের আদি পাঠ কীভাবে বিনির্মিত হয়েছে, বা হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা আলোচনা করতে আগ্রহী। বিনির্মাণ বলতে জাক দেরিদা কোনো একটি কথায় সীমাবদ্ধ থাকেননি। বিনির্মাণের আলোচনা তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ জুড়ে অনেক দিন ধরে অনেকগুলি মাত্রায় করেছেন। কিন্তু সব আলোচনার কেন্দ্রীয় ভাব সন্ধান করতে গেলে আমরা বুঝতে পারি তিনি আসলে টেক্সটের প্রচলিত ও লগ্ন অর্থকে প্রথমেই ঋণাত্মক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে তাকে নাকচ করতে চেয়েছেন। তিনি পাঠের প্রচলিত অর্থের মধ্যে একটা সন্ত্রাসবাদ অনুভব করেছিলেন।

দেরিদার মনে হয়েছিল ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের একটা সংস্করণ পাঠের মধ্যেও ক্রিয়াশীল। আর তাঁর মতে সেই অর্থগত সাম্রাজ্যবাদই পাঠকের কাছে সবথেকে বড় সন্ত্রাস। সব থেকে বড় থ্রেট। এই কেন্দ্রিয় অর্থের সাম্রাজ্যবাদকে তিনি উল্লেখ করেছেন বাক্‌কেন্দ্রিকতা বা লোগোসেন্ট্রিজম বলে। তাঁর মতে এই বাক্‌কেন্দ্রিকতা পাঠকের মননে চিন্তনে এমন এক জল-অচল পর্দা নির্মাণ করে যে, তাকে ভেদ করে পাঠের উপরিতলের অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো নীরব অর্থের এলাকা দৃষ্টিগোচর হয় না। পাঠক ওই মূল পাঠের উপরিতলের নির্মিত বাইনারি অপোজিশনের দ্বারা পরিচালিত হন। সেখানে থাকে একটা পক্ষপাতের নির্দেশক। হয় তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে পাঠক বেছে নেবেন সাদা, নয় কালো; হয় মন্দ, নয় ভালো। এর বাইরে অন্য কোনো বিচারধারা অনুসরণের ছাড়পত্র পাঠকের থাকছে না। রলাঁ বার্ত যে পাঠক প্রতিক্রিয়ার উপর পাঠের অস্তিত্বকে নির্ভরশীল করেছিলেন, দেরিদার মতে সেই পাঠক প্রতিক্রিয়াও এই পাঠগত সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্ত হতে পারবে না যদি সেই পাঠক পাঠের মধ্যে অন্তর্লীন এই সন্ত্রাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হন। তাই পাঠককে থামতে হবে পাঠের ক্ষেত্রে প্রতিপদে। ধাঁধাঁগ্রস্ত হতে হবে। দেরিদা যাকে বলছেন ‘অ্যাপোরিয়া’ (গ্রীক শব্দ, যার ইংরেজি অর্থ ‘Puzzlement’)। প্রশ্ন করে করে ভেঙে ফেলতে হবে পূর্ব অর্থের সাম্রাজ্যবাদী ইমারত। মনসামঙ্গলের মধ্যেও একটা

উপরিতলের অর্থের শাসন আছে। এই মধ্যযুগীয় কাব্যকে আমরা চাঁদ ও মনসার দ্বান্দ্বিক দর্পণের বাইরে দেখতে অভ্যস্ত নই। সেখানে আমরা আদি পাঠের অন্তর্গত বাইনারি অপোজিশনের দ্বারা পরিচালিত হই। মনসাকে আমরা হয় দেবী হিসেবে প্রণত হই, অথবা হিংসুটে দেবী হিসেবে ঘৃণা করি। চাঁদ সদাগরের ক্ষেত্রেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুরূপ। দেরিদা একেই আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছেন। বাংলা কবিতার বিস্তীর্ণ প্রান্তে সেই আক্রমণ বারবার ঘটেছে। বিনির্মিত হয়েছে মনসামঙ্গলের আদি পাঠ নানা মাত্রায়।

জীবনানন্দ দাসের ‘রূপসী বাংলা’, বিষ্ণু দে-র ‘এবং লখিন্দর’, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ‘বেহুলা’, অরুণ মিত্রের ‘ও বেহুলা’, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘লখিন্দর’ (কাব্য) ও ‘বেহুলা নাচানো স্বর্গ’ (কবিতা), জিয়া হালদারের ‘লখিন্দর’, দীপঙ্কর মাহমুদের ‘বেহুলার ভেলা’, শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর ‘মনসা-মঙ্গল’, বাবুল আহমেদের ‘বেহুলার ভেলা’ সহ অনেক কবিতায় মনসামঙ্গল বিনির্মিত হয়েছে। সমগ্র কাব্যগ্রন্থ জুড়ে না হলেও ছোট বড় কবিতায় মনসামঙ্গলের আদি পাঠ নানা ভাবে ভেঙেছেন বাংলার কবিরা বারবার। তিনটি পরিচ্ছেদে আমরা ক্রমান্বয়ে সেই ভাঙার চালচিত্রে বিনির্মানের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করব।

প্র থ ম প রি চ্ছে দ

বেহুলার শাড়ি : আবরুর নতুন সংজ্ঞা

আমরা যদি প্রশ্ন করতে বসি ‘নারী’ কী নিয়ে নারী, তবে আমাদের কাছে কিছু প্যারামিটার উপস্থিত হয়। না চাইলেও ভেসে ওঠে শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। চিহ্নায়িতের মতো। এই চিহ্নায়িত সত্তার মধ্যে যে চিহ্নগুলির সম্মিলন দেখতে পাই সেগুলি হল পেলব শরীর, পাতলা কণ্ঠ, শারীরিক ভাবে তুলনায় দুর্বল ‘অপর’ মানুষ, যিনি ‘শালীনতার’ সঙ্গে শরীরকে আচ্ছাদিত করে রাখেন। এর ভিন্ন হলে আমাদের চিহ্নজ্ঞানের সঙ্গে সংঘর্ষ হেতু চিহ্নায়িত সত্তাটিকে ‘পুরুষালী’ বা ‘কলঙ্কী’ হিসেবে আমরা অভিহিত করতে অভ্যস্ত। কিন্তু আমাদের চিহ্নজ্ঞানের সঙ্গে এমন কোনো সংঘর্ষ উপস্থিত হয় না ‘পুরুষ’ শব্দটি উচ্চারণ করলে। ‘পুরুষ’ নামক চিহ্নটি এই চিহ্নায়ক প্যারামিটারের অনেক উপরে। অনেক বেশি বহুকৌণিক। নারীর বাইরের জগতে বিচরণের ক্ষেত্রে আমাদের মনে একটা আবৃত অবয়বের ভাবনা চলেই আসে। আমাদের মন নারীর আবরুর মধ্যে শুচিতার সন্ধান করে ফিরতে অভ্যস্ত। বাংলা

কবিতা মনসামঙ্গলের বেহুলার মধ্যে সেই আবরুলগ্ন শুচিতার চেতনাকে নানা ভাবে ভেঙেছে। আমাদের স্বীকার করতে হবে এই বিষয়ে পুরোধা ব্যক্তিত্ব কবি জীবনানন্দ দাস।

জীবনানন্দের কবিতায় বেহুলায় আবরুর প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমরা যদি প্রশ্ন করি প্রাচ্যে 'নৃত্য' বিষয়টির উৎস নিয়ে, তাহলে আমরা কোন ধরনের উত্তরের সম্মুখীন হব! কোনো প্রতিষ্ঠানকে অপমান না করেও আমরা যদি সন্ধান করি কারা মূলত প্রাচ্যে চর্চা করতেন নৃত্যকলার! এক অস্বস্তিকর উত্তরের সামনে পড়তে হবে না কি আমাদের! দেবসভায় নৃত্য প্রদর্শন করতেন অপ্সরাবৃন্দ ও গান্ধর্বীরা। তাঁদের বিবাহ স্বীকৃত ছিল না। যাতে তিনি একজন পুরুষের ভোগে কেন্দ্রীভূত না হয়ে পড়েন। উপস্থিত সর্বজনের ভোগের সামগ্রী থাকতে পারেন। সবার মনোরঞ্জন করতে পারেন। আমরা যদি স্মরণ করি অপ্সরাদের দেবতারা নৃত্য প্রদর্শন ছাড়াও কী কাজে নিযুক্ত করতেন, তা হলে আমাদের পুনরায় এক অস্বস্তিকর উত্তরের সামনে দাঁড়াতে হয়। অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যে নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে একটা দৈহিক শোষণের সম্পর্ক থেকেই যাচ্ছে। মর্ত্যেও তার তর্জমা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় না। দেবদাসী, বাইজী থেকে অধঃপাতের সমকালে নাচনেওয়ালি, দৈহিক শোষণের থেকে মুক্ত নন নৃত্যকলার প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তির মধ্যে থাকা নারীরা। 'নৃত্য'কলাকে ভদ্রজনের চর্চার উপযোগী সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে অপেক্ষা করতে হয়েছে বহুকাল। কিছু ক্ষেত্রে আজও হয়নি। তার কারণ কিন্তু মূলত ওই দৈহিক শোষণ। এখন যদি আমরা মনসামঙ্গলের বেহুলার স্বর্গে গিয়ে নাচের দ্বারা সমস্ত দেবতার মনোরঞ্জনের বিষয়টি মুক্ত মনে ভাবতে বসি, তাহলে বেহুলার অবস্থাটা আমাদের কাছে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে আসে। সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি জীবনানন্দের কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছিল অনেক আগেই। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতা তার চিহ্নায়িত অভিজ্ঞান। বেহুলার বেআবরু হয়ে পড়ার আর্তনাদ কবিতার চরণ ভিজিয়ে অনাবৃত করেছে মনসামঙ্গলের এক অনুক্ত যন্ত্রণার ইতিহাস।

জীবনানন্দের কবিতায় বেহুলাকে আমরা প্রথম এমন এক তলে নেমে আসতে দেখলাম, যেখানে বেহুলা কেবল একজন স্বামীহারা নারী নন, তিনিই সমগ্র বাংলা। জীবনান্দের কলমের সৌজন্যে প্রথমবার আমরা লক্ষ করলাম বাংলার মৃত্তিকা জননীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছেন বেহুলা। পূর্বেই আমরা যে আলোচনা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, তারই সূত্র ধরে আমরা এখানে বলতে পারি, 'নৃত্যের' মধ্যে যে লাঞ্ছনা লুকিয়ে ছিল মনসামঙ্গলের বেহুলার অকথিত ইতিহাসে, তা কেবল তাঁর নিজস্ব

ইতিহাস নয়। নারীর সাধারণ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের কলঙ্ক থেকে মুক্ত নন বাংলার কোনো নারী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে প্রতিনিয়ত ভোগ্যসামগ্রী হিসেবে বিবেচনার অগ্নি পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হয়। কলাবিধৌ হয়ে 'নাচ' দেখাতে হয়। তাতেই পুলকিত হয় পুরুষ সমাজপতিদের ও সমাজনিয়ন্ত্রকদের শরীর মন। কিন্তু নারীর বেদনা! সে সব চাপা কান্না অনুরণিত হতে থাকে মাটির পৃথিবীর সর্বকোণে। জীবনানন্দ সে কান্না শুনেছিলেন :

> ... ---একদিন অমরায় গিয়ে
> ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
> বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।[২]

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা অন্তত এই কথাটা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি যে, আমরা কোনো শব্দকেই ছেড়ে কথা বলার পক্ষপাতী নই। আমরা এমনটা মনেই করি না যে, সৃজনের মধ্যে কোনো শব্দ মহান স্রষ্টা খেলাচ্ছলে বা বেখেয়ালে ব্যবহার করেন। আমরা মনে করি সৃজনের মধ্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে লেখকের চিহ্নায়ক স্বজ্ঞা। ভাষাবিজ্ঞানী তাকেই শৈলী বললে আমাদের আপত্তির কিছু থাকে না। তবে তাকে কেবলমাত্র শৈলী বললে আমাদের আপত্তি আছে। কারণ সংজ্ঞা নিরূপণের বিরুদ্ধ অবস্থান নিচ্ছি আমরা। সে যাই হোক, আমাদের বিশ্লেষণে সৃজনের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেখানেই আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ হচ্ছে কবি জীবনানন্দের উদ্ধৃত কবিতাংশটির মধ্যে ব্যবহৃত দুটি শব্দ 'ছিন্ন' ও 'খঞ্জনা'-র উপর।

প্রথমে আসি 'খঞ্জনা' শব্দটিতে। কেন এত পাখি থাকতে কবি 'খঞ্জনা'-কেই টানলেন লাঞ্ছিত বেহুলার উপমায় ('মতো' এই তুলনাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে লুপ্তোপমাটিতে)! কে এই খঞ্জনা! আমরা খোঁজ নিলে জানতে পারি 'খঞ্জনা' আসলে 'খঞ্জন'-এর স্ত্রী শব্দ। বাংলার নদী, জলাশয় ও উপকুলবর্তী এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় এই গায়ক পাখিকে। 'খঞ্জনা' গাইতে পারে না, পারে কেবল 'খঞ্জন'। এটি বাংলার পাখিভূক্ত হলেও আসলে পরিযায়ী। আসে আফ্রিকা থেকে। পাখি সমাজে এর নাম African pied wagtail। Motacilla গোষ্ঠীর এই পাখিটির প্রতি বাঙালি স্রষ্টাদের বহু পক্ষপাতিত্ব আমরা জীবনানন্দের আগেও দেখেছি। নন্দিনী নামটি উচ্চারণ হলেই যে রবীন্দ্রনাথ ও 'রক্তকরবী' নাটকের নাম আমাদের পাঠক চৈতন্যে উদয় হয়, সেই নন্দিনীরও প্রাথমিক নামটি ছিল 'খঞ্জন'। কিন্তু বেহুলার প্রসঙ্গে জীবনানন্দ 'খঞ্জনা' কথাটি ব্যবহার করলেন কেন! মাটির কাছাকাছি থাকা কবি জীবনানন্দ খঞ্জনাকে

চিনতেন না, তার বিষয়ে বিশদে জানতেন না, এমনটা মানতে আমরা প্রস্তুত নই। তিনি জানতেন খঞ্জনার সঙ্গে গান গাওয়ার একটা দূরতম যোগাযোগ থাকলেও নৃত্যের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। খঞ্জনার নৃত্য যদি সম্ভব হয়ও, তবে তা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হবে না। বেহুলার অমরায় নৃত্য যদি খুব স্বেচ্ছাকর্ম হত, তবে কবি কোনো নৃত্যপটীয়সী পাখির নাম করতেই পারতেন। করেননি, কারণ তিনি তা বোঝাতে চাননি। উপরন্তু অমররাজ্যে বেহুলা ত পরিযায়ীই। সেখান থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, আবার মানুষ রূপে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে এসেছেন, আবার ফেরত গেছেন, আবার ফিরে এসেছেন মনসার পুজো প্রচারের কাজ শেষে। সব দিক থেকেই 'খঞ্জনা' যুক্তিগ্রাহ্য উপমা।

'ছিন্ন' শব্দটি বেহুলার অনিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হওয়া, ধর্ষিতা হওয়া, অসহায়তার মধ্যে উপনীত হওয়ার মতো বিষয়গুলির অত্যন্ত সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছে। পিতৃতান্ত্রিক দুনিয়ায় বেহুলাদের এই রকম ছেঁড়া ফাটা হয়ে যাওয়াটাই তো ভবিতব্য। জীবনে সৃষ্টি সুখের গান গাইবেন বলে সপ্তপদীর সীমায় আসা নারীটিকে প্রাথমিক লগ্নেই সময় যে জীবনের অপচয় উপহার দিয়ে তাঁর সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করল, তার বেদনায় বিষিয়ে উঠেছে বেহুলার অনিচ্ছুক ঘুঙুর। কেঁদে উঠেছে বাংলার নদী, মাঠ, ভাঁটফুল বেহুলার অমররাজ্যে বেআবরু হওয়ার ঘটনায়। মনসামঙ্গলের সেই অকথিত ইতিহাস উন্মুক্ত হয়েছে জীবনানন্দের কলমে।

শুধু জীবনানন্দ নয়, স্বর্গীয় অবক্ষয় দেখেছিলেন একালের প্রতিবাদী কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও। কবি সরাসরি স্বর্গকে আখ্যায়িত করেছেন 'বেহুলা নাচানো স্বর্গ' হিসেবে তাঁর ১৩৬২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'মৃত্যুত্তীর্ণ' কাব্যের ওই নামেই অন্তর্ভুক্ত কবিতায়। অবশ্য বীরেন্দ্রর কবিতার বেহুলা এতটা অত্মসমর্পণ করেনি। তাঁর ভাবটা অনেকটা প্রতিস্পর্ধী। যে যৌনতার লিপ্সায় দেবতারা সদা উন্মুখ, সেই যৌনতার বিষেই বীরেন্দ্রর বেহুলা দেবতাদের পুড়িয়ে ভাসিয়ে দিতে চান। নারীর আবরুর কোনো মর্যাদা নেই যাঁদের কাছে, তাঁদেরও তিনি পরীক্ষায় একেবারে পর্যুদস্ত করতে চান আবরুর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেই :

একী যৌন-জ্বরের জলসায়
তুই তনু দিলি অঞ্জলি
হাসি কান্নার চুনি পান্নায়
ছুঁড়ে দিলি ছেঁড়া কঞ্চুলী[৩]

এই 'কঞ্চুলী' অর্থাৎ আবরুর শেষ চিহ্ন যে অন্তর্বাস, তা দেবতাদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেহুলার মধ্যে কী ভীষণ প্রতিস্পর্ধার স্থিরচিত্র এঁকে দিলেন, তা ভাবলে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। মনসামঙ্গলের অবলা নারী মৃত স্বামীকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনার অসম্ভবপ্রায় চেষ্টা করছেন, এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। একেবারে এমনটা না হলেও স্বামীকে নিরোগ রাখার প্রচেষ্টায় ভারতীয় নারীরা আজও শরীরকে পীড়ন দিয়ে নানা টুকরো-টাকরা আচরণ করেই থাকেন। দণ্ডী খাটা, উপবাস রাখা, ব্রত পালন, ঠাকুরের থানে বুকের রক্ত দেওয়া, এই সব আজও চলে আসছে। কিন্তু কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বেহুলা এসবের থেকে অনেক ঊর্ধে। অনেক অনেক বেশি সাহসিনী। মনসামঙ্গলের দেবসভায় বেহুলার লাস্য নৃত্যে দেবতাদের সন্তুষ্ট করার বর্ণনায় অদ্ভুত মিতবাক কবিদের অনুক্ত বয়ানের মধ্যে এক জোড়াল ভাঙন ধরালেন কবি। আমরা পেলাম দেবতাদের কামনার প্রতিস্পর্ধী সত্তায় আবির্ভূতা লেলিহান শিখাতুল্য বেহুলাকে। বেহুলার শরীর বেহুলার দাবি আদায়ের selling point নয়, তাঁর counter force হয়ে উঠেছে।

বেহুলার মধ্যে আমরা যদি আবহমানের নারীর অবদমনের ইতিহাস খুঁজতে চাই, তাহলে মুহম্মদ নূরুল হুদার 'বেহুলার শাড়ি' কাব্যগ্রন্থটি আমাদের সামনে একটা দৃঢ় সম্ভাবনার জন্ম দেয়। 'বেহুলার শাড়ি' বইটির প্রতিটি কবিতাই অন্য স্বরের। ভিন্ন মাত্রারও। মনসামঙ্গলকে এক অন্য উচ্চগ্রামে পাঠ করেছেন কবি। ক্রমাগত খনন করে বের করতে চেয়েছেন মনসামঙ্গলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নারীস্বর। যেমন 'বয়ে যায় দুই কূল' কবিতায় 'সতী' শব্দটাই হয়ে উঠেছে একটা পুরুষালী অভিপ্রায়ের সমার্থক। সতীত্ব রক্ষা আসলে নারীর নয়, পুরুষের নিজস্ব প্রয়োজন। এছাড়া তার ঈশ্বর-প্রমাণ হওয়ার আর অন্য কোনো পথ নেই। সতীত্ব আসলে পুরুষের নারীদেহের একক অধিশ্বর হওয়ার উপায়। ফলে প্রশ্নটা আর নারী বিশুদ্ধতার থাকছে না। হয়ে উঠছে পুরুষের বিশুদ্ধ একেশ্বর হওয়া। সেখান থেকেই যুদ্ধ, গোলা-বারুদ, সংযোগহীনতার পরিখা কাটা। মনসাও সেখানে হয়ে ওঠেন পুরুষের স্বার্থান্বেষী অভিপ্রায়ের অভিন্ন প্রতিষ্ঠান :

অনন্তর
মনমনান্তের সাধনার পর
যুগযুগান্তের পাঁচালি আর রুদ্রবীণা আর মনসামঙ্গলের পর
যখন রাঙাচেলি পরে পাল্কি চড়ে দেবী প্রবেশ করে পূজারীর
ঘর,

তখন মান ভাঙানো চাই, মন রাঙানো চাই, চাই পাইকপেয়াদা-
সান্ত্রীসেপাই-
গোলাবারূদ বা পরিখা খনন ছাড়া সতীরক্ষার আর কোনো
বিকল্প নাই... [৪]

যদি আমরা আজ সন্ধান করতে বসি ঠিক কী কারণে নারীর 'সতী' হওয়ার দরকার হল বা ঠিক কী ভাবে নারীর সতীত্ব রক্ষা করা সম্ভব, তবে আমাদের কান পাততে হবে সভ্যতার একেবারে আদি লগ্নে। সেই সময়ে গিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টি রাখতে হবে, যে সময়ে একটু একটু করে সমাজের খুঁটিগুলো পুঁতে সমাজপতিরা তার মাথায় ছাদ বসাচ্ছেন। সমবায়িক গোষ্ঠী জীবন আর 'আকর্ষণজীবী' খাদ্যাভ্যাস ছেড়ে মানুষ হয়ে উঠছেন সামাজিক ও 'কর্ষণজীবী'। কর্ষণজীবিতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে উৎপাদনশীলতায় স্বনির্ভরতা, তাই ধীরে ধীরে সমাজে ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব ঘটালো। সেই ব্যক্তিমালিকানাই সৃষ্টি করল উত্তরাধিকারের প্রয়োজন। এখন এই উত্তরাধিকারকে যদি সুনির্দিষ্ট করতে হয়, তাহলে নারী, যিনি ধারণ করবেন উত্তরাধিকারের ঐতিহাসিক ফলটি, তাঁকে করে তুলতেই হবে এক পুরুষ ভিন্ন অন্য পুরুষের অগম্য। একমাত্র তা হলেই একজন পুরুষ নিশ্চিন্ত হতে পারবেন তাঁর নিজের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে। সেই শুরু হল নারী জাতির ঐতিহাসিক মহাপরাজয়। সেই শুরু হল নারীকে অবরোধে পাঠানো। সেই শুরু হল নারীকে শাঁখায়, সিঁদুরে চিহ্নিত করে বা বোরখায় বা ঘোমটায় ঢেকে ফেলা। সেই শুরু হল শাড়িতে নারীকে আপাদমস্তক মুড়ে ফেলা। সেই শুরু হল সতীত্ব রক্ষার নিমিত্তে নারীর চারপাশে পরিখা কাটা। অন্যের অগম্য করে তোলার নামে নারীকে সীমায়িত করে ফেলা। নারীর অধিকার নিয়ে কুরুক্ষেত্র। নারীকে সর্বজনীন ভাবে লুঠ করার জন্যে স্বর্গীয় নৃত্যের আসর রচনা। নূরুল হুদা তাঁর কবিতাটিতে মনসামঙ্গলের ভিন্ন পাঠ নির্মাণ করে সেই ঐতিহাসিক ক্রমগতিকে আমাদের সামনে এনে দিলেন।

বেহুলার ভাসানযাত্রাকে আমরা মনসামঙ্গলের সবথেকে ঘটনাবহুল অধ্যায় হিসেবে জানি। তার প্রতি বাঁকে লুকিয়ে থাকে এক একটা উদ্বেগ, একটা টেনশান। এই বুঝি একটা কিছু বিপদ হল। কিন্তু যদি আমরা নিজেদের মনকেই সৎ ভাবে প্রশ্ন করি আমরা আসলে বেহুলার কোন বিপদ নিয়ে এত উৎকণ্ঠায় থাকি, তাহলে একটাই তো উত্তর আমাদের চেতনা আচ্ছন্ন করে। সেটা হল বেহুলার দেহ। আমরা কি প্রতিমুহূর্তে ভাবিত হই না এর পর কোন বাসনামদিরতার আক্রমণ কাটিয়ে যেতে হবে আমাদের বেহুলাকে! আমরা কি শঙ্কিত হই না গাঙুরের পরের বাঁকটিতেই বিপরীত

লিঙ্গের প্রতি কোন ধরণের বাসনার ঢাল খাড়া করে কে অপেক্ষা করছে সেই ভেবে! হই তো! তাই বেহুলার এই যাত্রা প্রতিমুহূর্তে তাঁর শাড়ি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় ভরা। নূরুল হুদা 'জরিপ' কবিতাতে তাই লিখে চলেন :

চম্পকনগর হয়ে দরিয়ানগর
ঘাটে ঘাটে এই জলস্বর
এই কলস্বর...
ধর, শুধু দেহটাকে ধর[৫]

নারীর জীবনধারণের নির্বিঘ্ন উজ্জাপনের জন্যে একজন পুরুষের ভূমিকা থাকতেই হবে। অন্তত সমাজবিধান তেমনটাই বলে। বিবাহিত নারীর জীবনে ভরকেন্দ্র তাঁর স্বামীই। সে স্বামী যেমনই হোক না কেন, সেই নারীর পথ চলার সম্বল। সতীর জীবনে পতির মূল্য নারী জন্ম গ্রহণের পর থেকেই বীজমন্ত্রের আকারে তাঁর কানের ভিতর দিয়ে যাপনের মর্মস্থল পর্যন্ত পৌঁছে দেন পরিবার। বেহুলার ভাসানের মূল উদ্দেশ্য যদি মনসামঙ্গলের ভাষ্যে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা হয়, তবে আর একটা ভাষ্য এই রকম হতে পারে, নারী জন্ম থেকেই জানে স্বামীছাড়া বা স্বামীহারা নারীর জীবনের মূল্য সমাজে কতটুকু। মৃত্যুর থেকে তা কোনো অংশে কম নয় বিবেচনা করেই তিল তিল মরণের থেকে শ্রেয় কিছু বেছে নেওয়াটা বেহুলার নিজস্ব চয়ন হতেই পারে। সে দিকের প্রতি নির্দেশ রেখে নূরুল হুদা লিখলেন তাঁর 'ছায়ার অক্ষরে' কবিতায় :

এ সব বোঝে না সতী, পতি তার শব
পতিহীনা সতী জানে ভুবন রৌরব[৬]

কলার মান্দাসকেই ব্যোমযান বানিয়ে বসা চিরকালের 'সতী' শাড়ি পরিবৃতা বেহুলাকে কি আর কোনো ভাবে দেখার ছাড়পত্র আছে! স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্যই বেহুলার ভাসানযাত্রা। এ তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু একজন শক্তিশালী নারীর কি এই অভিযানের পিছনে আর কোনো শর্ত থাকতে পারে না! মনসামঙ্গলকে অনুসরণ করলে নিশ্চয়ই থাকে না। কিন্তু তাকে ভাঙলে হয়তো থাকে। জীবনের একটা নতুন অধ্যায় শুরুর মুহূর্তেই তাঁকে শূন্যতা উপহার দিয়েছেন মনসা। কিন্তু তেজোদীপ্তা নারী সেই শূন্যতা মেনে নেবেন কেন! সে শূন্যতা তো তাঁর বেছে নেওয়া নয়! 'ফিরবোই যদি' কবিতায় নূরুল হুদা লিখলেন :

টুকরো টুকরো, কিংবা ফালি ফালি
আপত্তি নেই কিছুতেই,
আপত্তি শুধু শূন্যে;

ফিরবোই যদি,
কেন মিলিত হয়েছিলাম
সাতজনমের পুণ্যে?[৭]

এই একই প্রত্যয় আমরা লক্ষ করেছি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লখিন্দর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বেহুলা' নামের সনেটটিতে। একটা নাছোড় মনোভাব ঝলসে উঠেছে বেহুলার মধ্যে :

সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
বসে আছি রক্ত পুঁজে মাখামাখি রাত্রি
ভেলায় ভাসিয়ে। আমি কান্নার যন্ত্রণা
গঙ্গায় সাগরে রেখে কাক তাড়াই।[৮]

আমাদের নজর রাখতে হবে 'কাক' শব্দটিতে। এমন এক শবভোজী পাখি যার মাধ্যমে সহজেই চিহ্নায়িত করে যায় এমন এক শক্তিকে, যে বা যারা বিলুপ্ত করে দিতে চায় স্বামী নামক সতীত্বের আশ্রয়টুকু। ব্যর্থ করে দিতে চায় বেহুলার অভিযানের যাবতীয় প্রয়োজন। সেই সঙ্গে আমাদের প্রশ্ন জাগে শবদেহে পরিণত হওয়া স্বামীকে ঘিরে এত প্রত্যয়ের শক্তি বেহুলা সংগ্রহ করে কোথা থেকে! এখানে এসেই বাংলার শাড়িতে আবৃতা নারীর সঙ্গে সমগ্র বঙ্গজননীকে একীভূত করে বেহুলা আমাদের জানিয়ে দেন সে প্রশ্নের উত্তর :

তবু আমি বাংলার বিধবা
সতী, তাকে ফিরে পাব, হয়েছি সাবিত্রী।
পাতালে নরকে কিংবা যমের দুয়ারে
যেখানে ভিড়বে ভেলা, যাব। সমুদ্রেও
শান্ত প্রতীক্ষার স্তোত্র গাঁথব পয়ারে;[৯]

'আবরু' বললেই তো আমাদের স্টক রেসপন্স কেবল নারীর প্রয়োজনের কথাই স্মরণ করতে অভ্যস্ত। পুরুষের আবরুর দরকার নেই? না থাকলে কেন নেই? এই সব উল্টোস্রোতের প্রশ্নপত্র আমাদের মাথায় যদি উদিত হয়, তবে তার নিরসনের ব্যবস্থাও আছে। পুরুষের ক্ষেত্রে 'আবরু'র দরকার নেই কারণ পুরুষকে সতীত্ব রক্ষা করতে হয় না। 'সতী' শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গবাচক, এবং এর লিঙ্গান্তরের সংস্থান পৃথিবীর ব্যাকরণে নেই। পুরুষ ঐতিহাসিক ভাবেই বহুগামী হওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে আসছে। পৃথিবীর কোনো সমাজেই সামাজিক বিচারে পুরুষের বহুগামিতা তেমন ভয়ঙ্কর দোষাবহ নয়।

সতীত্ব আরোপিত কর্তব্যের মতো পালন করে যেতে হবে নারীকে, তার রক্ষার দায়িত্ব নারীরই, তারও পরে নারী হতে পারেন ধর্ষিতা, সেক্ষেত্রেও দায় নিতে হবে নারীকেই, লজ্জিত হতে হবে। ধর্ষকের কোনো দায় নেই, লজ্জাও নেই। সামাজিক ভাবে স্বীকৃত বহুগামী প্রিভিলেজড পুরুষের সে বিচ্যুতির পিছনে সন্ধান করা হবে নারীর তরফ থেকে কোনো ভাবে অনুপ্রেরণা বা প্ররোচনা ছিল কিনা। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি পাশ্চাত্য সাহিত্যের অরফিউস ছাড়া এমন পুরুষ চরিত্র সমগ্র বিশ্বের লিখিত উপাদানের মধ্যেই বিরল, যিনি পুরুষ হয়ে নিজের জীবনসঙ্গিনীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্যে মৃত্যুলোকের ওপারে অভিযান করেছিলেন। কিন্তু এমন নারী চরিত্রের অভাব নেই। মনসামঙ্গলের বেহুলা নিঃসন্দেহে সেই স্রোতের এক উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। কিন্তু কবি অরুণ মিত্র মনসামঙ্গলের সেই পরিচিত বহতার উল্টোদিকে হাঁটতে চেয়েছেন তাঁর ‘ও বেহুলা’ কবিতায়।

এক অদ্ভুত নাটকীয়তায় মোড়া অরুণ মিত্রের কবিতাটি। এক শুষ্ক সময়ের বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে কবির মনে হচ্ছে আমাদের জীবন থেকে বেহুলারা ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। কবিতাটা লিখছেন কবি বাংলায় যখন নকশাল আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে সেই সময়। যদিও সেটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনে (‘অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা’) সংকলিত হচ্ছে ১৯৯১ সালে (এপ্রিল মাসে)। নকশাল আন্দোলন দমনের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার লখিন্দর। কিন্তু কোথাও বেহুলাদের দেখা নেই। ফলত অমরলোকে যাত্রা এক অসম্ভব মিথে পরিণত হচ্ছে। অস্থির সময়ে অস্থির কবি তাই বেহুলাকে আহ্বান করছেন মরলোকের ওপার থেকে। কথা বলতে চাইছেন বেহুলার সঙ্গে। জানতে চাইছেন বেহুলার থেকে সেই সব কথা যা মনসামঙ্গলের কবি জানাননি। আর সেখানেই আমরা চমকে উঠি কবির প্রশ্নের অভিমুখ দেখে। কবিতায় প্রথমে কবি বেহুলার সঙ্গে একটু আলাপচারিতা পর্ব সেরে নিচ্ছেন। প্রশংসা করছেন বেহুলার রূপ গুণের। আমরা বুঝতে পারছি একটা প্রোযেক্টারের মতো কবিতার পর্দায় আলো ফেলে ফেলে কবি পাঠকদের সামনে বেহুলার মূর্তিটা স্পষ্ট করে তুলতে চাইছেন। বোঝাতে চাইছেন তিনি ঠিক কোন নারীর কথা বলছেন বা কোন নারীর সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা বুঝতে পারছি। বেহুলাও কবির বর্ণনায় নিরুত্তর। তাঁর কীই বা বলার থাকতে পারে! কিন্তু এই চলমানতার মধ্যেই কবি বেহুলার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছেন এক বিদ্যুৎ চমকের মতো প্রশ্ন :

ও বেহুলা, এখন বলো তো আমায় লোহার বাসরঘরে অন্ধকারে
সাপটা

যদি ভুল করে লখীন্দরের বদলে তোমাকে ছোবল দিত, তাহলে
কী হত।[১০]

এতক্ষণের শ্রোতা বেহুলার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত হয়ে উঠি আমরাও। সত্যিই তো, এমনটাও তো হতে পারত! সংক্ষিপ্ত মস্তিষ্কের ও দুর্বল দৃষ্টির সরীসৃপ রাতের ঘনপিনদ্ধ অন্ধকারে ভুল করে বেহুলাকে দংশন করতেই পারত! তাহলে তো মনসামঙ্গলের কাহিনিটাই উল্টোদিকে বাহিত হতে শুরু করত! বুঝতে পারছি কবি অরুণ মিত্র মনসামঙ্গলের প্রচলিত প্রতিবেদন ভেঙে খানখান করে দিচ্ছেন। আমরা উদগ্র হয়ে উঠছি বেহুলার মতোই। বেহুলাও আর উত্তর দিতে পারছেন না। এমন সম্ভাবনা তাঁর মাথায় আসেনি আগে। এত শতাব্দীর পাঠকের মাথাতেও আসেনি। মধ্যযুগীয় কাব্যের প্রচলিত ডিসকোর্স তছনছ করে দেওয়া বৈপ্লবিক বয়ানের সামনে আমাদের এনে উপস্থিত করছেন কবি। আমরাও ভাবছি বেহুলা বিহনে লখিন্দরের কী হতো সেই নিয়ে। লখিন্দরও কি বেহুলার সর্পদষ্ট শরীরটা নিয়ে কলার মান্দাসে চেপে প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্যে নদীতে ভেসে যেতেন! স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে নাচ দেখাতেন বা গান শোনাতেন! লখিন্দরের পথেও কি একের পর এক বিপদ এসে দাঁড়াত! কেমন হত একজন পুরুষের পথপ্রান্তে অপেক্ষমান বিপদ! বেহুলাও হয়ত এইসব সাত-পাঁচ ভেবেই নিরুত্তর ছিলেন। কবি তখনি উচ্চারণ করলেন :

তাহলে শোনো, কী ঘটত আমি বলে দিই।[১১]

কবি বলে চলেন ‘কী ঘটত’। বলে চলেন ঠিক তেমনটাই, যেমনটা ঘটে থাকে আমাদের সমাজে। লখিন্দর সুন্দরী, লাস্যময়ী স্ত্রীকে হারিয়ে পাগলবৎ হয়ে যেতেন। কলার মান্দাসে স্ত্রীর দেহটা চাপিয়ে তাকে ভাসিয়ে দিতেন নদীর জলে। কিন্তু নিজে ভাসতেন না। সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে ঘুরে ফিরতেন কিছুকাল। তারপর! তারপর মাস দুই বাদে আবার একটা বিবাহ করতেন। এবারের স্ত্রী বেহুলার মতো সুন্দরী বা অমন পেলব দেহের হত না হয়ত। কিন্তু সেসব তো মুখ্য নয়। পুরুষের একজন নারী দরকার। নারী দরকার যৌনতার জন্যে। সেটা হয়ে গেলেই লখিন্দরের ক্ষতে প্রলেপ পড়ে যেত। কোনো রকম অসাধ্য সাধনের গল্প সেখানে নির্মিত হত না। কারণ নারীর আবরু রক্ষার প্রধান সহায় বা উদ্দেশ্য, যাই বলি না কেন, সে যদি স্বামী হয়, স্বামীর ক্ষেত্রে তো তেমন কোনো বিষয় থাকছে না। তার কাছে স্ত্রী ততটাই প্রয়োজনের, যতটা প্রয়োজন যৌনতার।

বেহুলাকে, বেহুলার সতীত্বকে, বেহুলার আবরুকে নানা মাত্রায় ভেঙেছেন বাঙালি কবিরা। কখনো তিনি হয়ে উঠেছেন অসহায় বেদনাতুর ধর্ষিতা নারী। কখনো

তাঁকে দেখি নিজের শরীর নিয়েই গড়ে তুলেছেন প্রতিরোধ। কখনো তাঁর আবরুর অহংকার এক প্রবল আত্মবিশ্বাসের মতো ঝড়ে পড়েছে কবিতার চরণে চরণে। কখনো কবির প্রথাভাঙা প্রশ্নের সামনে নিজের সবটুকু নিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন মৌনী শ্রোতা। কখনো আবার তাঁকে দেখি কালের অপচয়িত যুবমনের কাছে শেষ আলম্বনের মতো অনন্ত প্রেরণাময়ী। তাঁর আঁচলের ছায়ায় মৃতবৎ শুয়ে থেকেও শান্তি। বেহুলা তখন আশ্রয়। ১৩৭৫ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার 'অলিন্দ' পত্রিকায় প্রকাশিত কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'বেহুলা' কবিতাটিতে বেহুলা সেই আশ্রয়ের অভিজ্ঞান। তাঁর শাড়ির আর কোনো পরিচয় নেই কেবল আঁচল ছাড়া। তাঁর নাচের আর কোনো সংজ্ঞা নেই দুঃখ নিবারণ ছাড়া। লখিন্দর হল সেই শববৎ অথচ বিক্ষুব্ধ যুবমন, যাঁর কাছে বেহুলার ভেলা চারপাশের স্রোত আর জঙ্গমতার মাঝে একমাত্র থিতু হওয়ার জায়গা। তাই প্রবল আকুতিতে লখিন্দর বলে চলে :

নাচো নাচো বেহুলা আমার,
বর্ষণ-ভোলানো নাচ নাচো
নদী উৎসে এসে গেছে।[১২]

নদীতে বয়ে চলা বেহুলা কখনো হয়ে উঠেছেন কালের প্রতীক। এমন এক কাল, যেখানে রয়েছে প্রাণভরে বাঁচার ঠিকানা। প্রেম ও পুষ্টিতে ভরা বেহুলার মধ্যে নদী ও নারী মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। বিষ্ণু দের 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের 'এবং লখিন্দর' কবিতাটি বেহুলার সেই নদী পরিচয়ের সমীকৃত রূপ :

হৃদয়ে তোমাকে পেয়েছি, স্রোতস্বিনী!
তুমি থেকে থেকে উত্তাল হয়ে ছোটো,
কখনো জোয়ারে আকণ্ঠ বেয়ে ওঠো,
তোমার সে রূপ বেহুলার মতো চিনি।[১৩]

বাংলাদেশে শাড়ি হল নারীর আবরুর চিরকালীন পোশাকি রূপ। বঙ্গের বধু শাড়িতেই সুন্দর। যদি শাড়ি নিয়ে আমরা কোনোরকম রোমান্টিকতা না রাখি, যদি একটা রূঢ় নারীবাদী পাঠের মধ্যে উপনীত হতে চাই, তাহলে হয়ত বলা যায় শাড়ি বাঙালি বধূকে জগৎ থেকে পুরোদস্তুর লোপাট করে দেওয়ার এক সুচিন্তিত সূচিশীল্প। কিন্তু এই সব তর্কে না গিয়েও বলা যায়, বেহুলার শাড়ি শুধু সুতো দিয়ে গড়া বহিরাধার নয়। শুধু আবরুর চিরপরিচিত অভিজ্ঞান নয়। বাংলার কবিরা বারবার মনসামঙ্গল ভেঙে দেখিয়েছেন সে শাড়ি আসলে প্রেম, আশ্রয়, প্রতিজ্ঞা, প্রতিরোধ, বেদনার নকশিকাঁথা। এক একজন কবির কলমে সে শাড়ির এক একরকমের বর্ণ

উদ্ভাসিত হয়েছে। সেই শাড়িতে আবৃতা বেহুলাও আমাদের চেতনায় হাজির হয়েছেন বর্ণালির নানামাত্রিক সুষমায়। এখানেই বেহুলার বাংলা কবিতায় বিনির্মাণ মনসামঙ্গলের এক কেন্দ্রীয় নারীকে বহুরৈখিক অর্থে উন্মুক্ত করে। নির্মিত হয় আবরুর নতুন সংজ্ঞা।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আধুনিক বাঙালি কবিদের সৃজনে কীভাবে নারীর আবরু-ভাবনা মনসামঙ্গলের বেহুলা চরিত্রকে ভেঙে ভেঙে নতুন নতুন অর্থের শরীর পরিগ্রহ করেছে, তা আমরা পর্যালোচনা করেছি। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বিভিন্ন কবির প্রাসঙ্গিক কবিতাকে আলোচনায় সাঙ্গীকৃত করেছি। নারীর শাড়ি আসলে নারীর লজ্জা নিবারণের, আবরু রক্ষার বিষয় হিসেবেই কালান্তরে নির্দিষ্ট হয়ে আসছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোয়। কিন্তু নারীরই কেন লজ্জা থাকবে, সেই সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন একালের কবিরা। বেহুলার শাড়ির মধ্যে তাঁরা বুনে দিতে চেয়েছেন নারীত্ব আর আবরুর নতুন সংজ্ঞা। বেহুলাকে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন নতুন ভাবে। সতীত্বের এক ধনাত্মক মাত্রা নির্মিত হয়েছে একালের কবিদের মনসামঙ্গল কাব্যের পাঠগত বিনির্মাণে।

দ্বি তী য় প রি চ্ছে দ

ক্ষমতার বিপক্ষে লড়াই ও স্বাধীনতার নির্ঘোষ : কবিতায় মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গলে যে ক্ষমতার দুটি ভরকেন্দ্র ছিল তা বিশ্লেষণ না করলেও চলে। সেই ভরকেন্দ্রের একদিকে মনসা আর অন্যদিকে চাঁদ সদাগরের অবস্থান। একদিকের পরিচিতি প্রতাপে, অন্যদিকের পরিচিতি প্রতিজ্ঞায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তির কথা যদি আমাদের বলতে হয়, তবে দুই তরফে দুইরকম শক্তির সহায় ছিল। মনসার শক্তি যদি আধিভৌতিক দৈবী শক্তি হয়ে থাকে, তবে চাঁদ সদাগরের ভরসা আত্মশক্তি আর আত্মবিশ্বাস। মনসার ক্ষেত্রে আমরা বারবার আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখেছি মনসামঙ্গলে। কোনো রকম প্রতিরোধের সামনে পড়লেই তাঁকে দেখি ভয় পেতে, সহচরী নেতার সঙ্গে পরামর্শ করতে। এমনকি চাঁদ সদাগরকে যতবার তিনি আক্রমণ করেছেন, ততবারই সে আক্রমণের জন্যে ছলনা আর কৌশল অবলম্বন করেছেন। সম্মুখ সমরে কদাপি মনসা উপনীত হননি। অপরদিকে চাঁদ সদাগর বরাবর সম্মুখ

সমরের পথ নিয়েছেন। হেঁতালের লাঠির আঘাতে ভেঙে দিয়াছেন মনসার কাঁকালি। পদাঘাতে চূর্ণ করেছেন মনসার ঘট। চারিদিকে বন্ধ করে দিয়েছেন মনসার পুজো। সেই লড়াই জারি রেখেছেন মনসামঙ্গলের শেষ পর্যন্ত। এই বিষয়টিই একালের কবিসত্তাকে উদ্দীপ্ত করেছে। অনিয়মের বিপক্ষে নিজেদের মনের সুপ্ত জেহাদ বারবার রূপক হিসেবে আশ্রয় করতে চেয়েছে চাঁদ সদাগরকে। কখনো কখনো বেহুলা বা লখিন্দরকেও। ক্ষমতার বিপক্ষে লড়াই এমন এমন মাত্রা লাভ করেছে, যা মনসামঙ্গলের পাঠকে বহুকৌণিক সম্ভাবনা দিয়েছে।

মনসামঙ্গলের যদি আদি বয়ান ধরি আমরা, তা হলে সেখানে মনসার বিপক্ষে চাঁদ সদাগরের অবস্থান পেয়ে যেতে পারি সহজেই। মনসার পুজো প্রার্থনায় জবরদস্তির বিরুদ্ধে চাঁদ সদাগরের প্রতিবাদও চোখে পড়ার মতো। তা হলে প্রশ্ন উঠতে পারে একালের বাঙালি কবিরা মনসামঙ্গল ভেঙে এমন কী প্রতিবাদী প্রতিবেদন নির্মাণ করলেন, যার থেকে আমাদের মনে হতে পারে মনসামঙ্গলের প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন! সেটা আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, বাঙালি কবিরা মনসামঙ্গলের অন্তর্গত প্রতিবাদের অভিমুখের মধ্যে ঘটিয়েছেন সৃজনশীল অন্তর্ঘাত। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের শৈবসত্তা অত্যন্ত বলবতী ছিল। তাঁর মনসার বিপক্ষে প্রতিবাদ ছিল মূলত ধর্মাচরণের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে। তিনি শিব সাধক। শিবের রয়েছে পৌরাণিক মর্যাদা। আছে ঐশ্বরিক ঊর্বা। প্রাক্মানবজন্ম থেকে জন্মাবধি চাঁদ শিবের চরণে নিবেদিত প্রাণ। তিনি কিছুতেই মান-মর্যাদাহীনা 'চ্যাংমুড়ি কানী' মনসার পুজো করবেন না। তাঁর হাত কেবল শিব শূলপানির পুজোই করবে, এই ছিল চাঁদ সদাগরের জেদ। এখানেই বিরোধ। এভাবেই গতিমান হয় মনসামঙ্গলের কাহিনি। কিন্তু একালে দাঁড়িয়ে বঙ্গ কবিদের হাতে চাঁদের শৈবসত্তা অনেক ক্ষেত্রেই মূল্য হারিয়েছে। বরং মূল্যবান হয়ে উঠেছে ক্ষমতার বিপক্ষে চাঁদের আওয়াজ তোলার মানসিকতা। মূল্যবান হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গলের মৃতদেহ হওয়ার জন্যেই সৃষ্ট চরিত্র লখিন্দরের নির্বাক আওয়াজকে কান পেতে শোনা ও তাকে ভাষাদান করা। মূল্যবান হয়ে উঠেছে বেহুলার সর্বস্ব হারানোর বিরুদ্ধে অকথিত প্রতিবাদের বজ্র নির্ঘোষ। আর এখানেই বিনির্মিত হয়েছে মনসামঙ্গলের আদি পাঠ বারবার।

পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানে উল্লেখ নেই স্বপ্ন দেখার অধিকারের কথা। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষার সঙ্গে স্বপ্ন দেখার অধিকারও যে মানুষের দরকার, সেকথা পৃথিবীর সংবিধান প্রণেতারা অনুধাবন করেননি। কিন্তু ওই স্বপ্ন দেখার অধিকার ছাড়া

মানুষের যে বেঁচে থাকা গতিরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি! একমাত্র স্বপ্ন দেখার অধিকারেই ত মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারে এমন এক পৃথিবীর ছবি, যেখানে শোষণ নেই, যন্ত্রণা নেই, পীড়ন নেই। তাই সংবিধানে উল্লেখ না থাকলেও স্বপ্ন দেখার অধিকারই মানুষের সব থেকে বড় মৌলিক অধিকার, যা মানুষকে মানুষের পরিচয়ে বাঁচতে সাহায্য করে। সে ভাবতে পারে যে সামূহিক শোষণের সমকালে সে বাস করছে, বিপ্লব-প্রতিবাদ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার বদল সম্ভব। চাঁদ সদাগরও হয়ত স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন এক পৃথিবীর, যেখানে থাকবে না সাপের ভয়, বিষের ভয়, অপঘাতে মৃত্যুর ভয়। দেখেছিলেন এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন, যেখানে তাঁর সন্তানরা সুরক্ষিত থাকবে, সুরক্ষিত থাকবে তাদের বাসরঘর, সুরক্ষিত হবে তাদের মধুর মিলন, সুরক্ষিত হবে আগামী আরও একটা প্রজন্মের আগমন সম্ভাবনা। সেই স্বপ্ন দেখা চাঁদ সদাগরকেই আমরা আবিষ্কার করলাম কবি শঙ্খ ঘোষের ‘হেতালের লাঠি’ কবিতায়। স্বপ্নকে সাকার করে তোলার জন্যেই শঙ্খ ঘোষের চাঁদ সদাগরের হাতে উঠে এসেছে সশস্ত্র বিল্পবের প্রতীক স্বরূপ একটা শক্তপোক্ত ‘হেতালের লাঠি’।

‘হেতালের লাঠি’ প্রথম প্রকাশ পায় শারদীয়া ১৩৯০ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায়। পরবর্তী কালে কবিতাটি সংকলিত হতে দেখি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত কবির বিখ্যাত ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ কাব্যগ্রন্থে। কবির ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সংকলনেও স্থান পেয়েছে কবিতাটি। গোটা কবিতাটাই কবি উপস্থিত করেছেন নিজের জবানিতে। কিন্তু এমন ভাবে করেছেন, যাতে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা না হয়, এই জবানি একই সঙ্গে চাঁদ সদাগরেরও। এখানে চাঁদ স্বপ্নাতুর চাঁদ। সচেতন এক বিপ্লবী। তাঁর সচেতনতা এমন এক সম্বিতে পৌঁছেছে, যেখানে তিনি কোথাও কোনোভাবে নিজের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে প্রতিবপ্লবী জাগরণের সম্ভাবনা রাখতে চান না। ‘হেতালের লাঠি’-র মধ্যে আমরা যে চাঁদ সদাগরকে পাই, তিনি অনেকটাই বামপন্থী বিল্পবের আদর্শে দীক্ষিত। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বলেছিলেন :

> প্রতি ঐতিহাসিক যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং বিনিময়ের ব্যবস্থা এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতি, সামাজিক সংগঠন যে ভিত্তি গঠন করে তার উপর নির্মিত হয় এবং কেবল যা থেকেই ব্যাখ্যা করা যায় ঐ যুগের রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক ইতিহাস; ফলত মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস (জমির উপর সাধারণ মালিকানা চিহ্নিত আদিম উপজাতি সমাজের অবলুপ্তির

> পর থেকে) হলো শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস, শোষক ও শোষিত, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণির সংগ্রামের ইতিহাস; শ্রেণিসংগ্রামের এই ইতিহাস বিবর্তনের এক ধারা সৃষ্টি করে যা আজকের দিনে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখানে একই সঙ্গে গোটা সমাজকে সকল শোষণ, নিপীড়ণ, শ্রেণিপার্থক্য ও শ্রেণিসংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত না করে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণিটি---অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণি-শোষক ও শাসকের, মানে, বুর্জোয়া শ্রেণির কর্তৃত্বের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে না।[১৪]

ছয় পুত্র, সপ্তডিঙা মধুকর হারিয়ে চাঁদ যখন সর্বহারা, তখনি তাঁর মনে হয়েছে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থা থেকে দেওয়াল তুলেই লড়তে হয়। লড়তেই হবে। মনসা হল সেই শোষক শক্তি, যাঁর সঞ্চরণ সামাজিক প্রগতির পক্ষেই ভয়ঙ্কর। বেহুলা আর লখিন্দর হল সেই উৎপাদনশীল ভবিষ্যত, যাদের আজ যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। মনসা নামক প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে চেতনাকে এমন জাগরূক রাখতে হবে, যাতে কোনো ছিদ্র পথেই সে ভবিষ্যতকে দংশন না করতে পারে। তাই চাই এক অতন্দ্র প্রহরা :

> হেতালের লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে
> কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক
> এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের
> শিয়রে কুণ্ডল করে, কেটে যাক প্রেমের প্রহর।[১৫]

কিন্তু শোষকশক্তি সবসময়ই প্রবল। তাঁরা কোনো কসুর রাখেননা নিজেদের শোষণ কায়েম রাখতে। তাই প্রতি মুহূর্তে তাঁরা বিল্পবী চৈতন্যে ছড়িয়ে দেন অবিশ্বাস আর প্রতিক্রিয়ার নিদ্রালুতা। বিল্পবের ইচ্ছেটাকেই ভিতর থেকে নষ্ট করে দেওয়া শ্রেণিশত্রুদের প্রাচীনতম এবং কার্যকরী কৌশল। চাঁদ সদাগরেরও তেমনই অসহ্য হয়ে ওঠে প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো :

> কিন্তু বড়ো ঘুম, এক কালঘুম মায়াঘুম কেন
> কেবলই জড়ায় চোখ, অবসাদে ভরে দেয় শিরা
> সমস্ত চেতনা ঘেরা নাগিনীপিচ্ছিল অন্ধকারে
> ঢিল হয়ে আসে মুঠি, খসে আসে হেতালের লাঠি।[১৬]

বিল্পবের সৈনিকদের সবসময় এই কথায় সাবধান করা হয় যে, যখন প্রতি ঘুমায়, তখন প্রতিক্রিয়াশীলরা জেগে ওঠে। তাই বিপ্লবীর পক্ষে ঘুম ভয়ঙ্কর। এই ঘুম শরীরের নয়, চেতনার। কারণ একমাত্র জাগ্রত চেতনাই দিতে পারে মুক্তির দিশা। হাজার পতনের মাঝেও, হাজার রক্তাক্ত হওয়ার মাঝেও জারি রাখতে হয় বিপ্লবীর পথ চলা, জেগে থাকা, স্বপ্ন দেখা। 'হেতালের লাঠি' কবিতায় লখিন্দর-বেহুলা শুধু এক একজন সম্ভাবনাময় পুরুষ বা নারী নন। তাঁর আসলে একটা এমন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতীক, যেখানে শোষণের নামগন্ধ থাকবে না। এমন এক সম্ভাবনাময় অভিযানের প্রতীক তাঁরা, যাঁদের যাত্রাপথ আগামী পৃথিবীতে সকলের খাদ্য পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিৎ করে, উৎপাদনশীলতা ও প্রজননশীলতার পথ প্রশস্ত করে :

দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবী সুন্দরতর ক'রে
নক্ষত্রবিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে
আর যতদূর যায় ধানে ভরে যায় ততদূর।[১৭]

এই শস্যশ্যামল ভবিষ্যতকে শুধু স্বপ্নে দেখলে হয় না, তাকে রক্ষা করতে চাই অবিরাম জাগ্রত চেতনার সংগ্রাম। কারণ বিপ্লবীর জীবনে স্থিতির কোনো স্থান নেই। বিপ্লব এমন কোনো পন্থা নয়, যার মাধ্যমে বদল এনে সেই বদলকে চিরস্থায়ী করে ফেলা যায়। বিপ্লব এমন এক প্রক্রিয়া, যাকে ক্রমাগত অনুশীলন করে যেতে হয়। না হলে স্বয়ং বিপ্লবীর মধ্যে প্রতিবিপ্লবী সত্তার জন্ম নিতে দেরি হয় না। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। তাতে বিপ্লবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে পড়ে। ব্যর্থ হয় বিপ্লবলব্ধ ফলাফলও। সে সচেতনতা থেকে কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় চাঁদ সদাগর উচ্চারণ করেন :

আমি শুধু এইখানে প্রহরীর মতো জেগে দেখি
যেন না ওদের গায়ে কোনো নাগিনীর শ্বাস না লাগে
যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে
শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথনগরে
হেতালের লাঠি যেন এ-কালপ্রহরে মনে রাখে
চম্পকনগরে আজ কানীর চক্রান্ত চারদিকে।[১৮]

সশস্ত্র বিপ্লব ভিন্ন সমাজকাঠামোয় একটা উল্লেখযোগ্য বদল সম্ভব নয় বলেই বিশ্বাস করে বামপন্থী বিল্পবের তত্ত্ব। শোষিত শ্রেণিকে সচেতন করে তাদের দিয়েই সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করার মাধ্যমেই সম্ভব একটি দেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ফ্রেমের বড় ধরনের বদল। আর এই বদল না হলে শ্রেণি শোষণের

সমকালে ভবিষ্যত সুরক্ষিত ও সুলালিত হতে পারে না। মিলতে পারে না 'কানী'রূপী প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণিশোষকের থেকে সামূহিক মুক্তি। বিপ্লবী চাঁদ সদাগর কবি শঙ্খ ঘোষের মনসামঙ্গলের পাঠগত বিনির্মাণের ফসল।

শুধু চাঁদ সদাগর নয়, একালের কবিতায় প্রতিবাদ দেখেছি লখিন্দরের মধ্যেও। মনসামঙ্গল লখিন্দরকে ঠিক ততখানি আয়ু দিয়েছিল, যতখানি দিলে বেহুলার সতীত্ব প্রতিপন্ন করা যায়। ততখানি আয়ু, যতখানি ভিক্ষা দিলে মনসার উদ্দেশ্য বা প্রতিহিংসা, যাই বলি না কেন, চরিতার্থ হয়। সেই অকিঞ্চিৎকর আয়ুর মাঝে বেশিরভাগটা আবার লখিন্দর নির্বাক। একেবারে বোবা। বিয়ে করতে যাওয়া ছাড়া আর কালনাগিনীর দংশনে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া মনসামঙ্গলে লখিন্দরের কোনো কাজ নেই। তাঁর কথা কেউ শোনার ছিল না। তিনি ছিলেন কেবল করুণার পাত্র। জন্ম থেকেই মনসার জন্যে এবং একই সঙ্গে মৃত্যুর জন্যে বলি প্রদত্ত। তিনি মারা যাবেন, আর সনকা থেকে কালান্তরের শ্রোতা অমন ফুলের মতো তরতাজা জোয়ান ছেলের অপঘাতে মৃত্যুতে অশ্রু বিসর্জন করবেন, এই ছিল লখিন্দরের নিয়তি। আধুনিক কবিতায় তিনি সেই চিরাচরিত নিয়তি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। একালের পাঠকের কাছে কথা বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন মৃত্যু নামক ভবিতব্য দিয়ে তাঁকে বিচার করা যাবে না। আমরা এক প্রতিবাদী লখিন্দরকে আবিষ্কার করি কবি জিয়া হায়দারের 'লখিন্দর' কবিতায়।

লখিন্দরের মধ্যে শারীরিক বা মানসিক কোনো অস্বাভাবিকত্ব তো মনসামঙ্গলের কোনো প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। বরং এক সুষম বিকাশপ্রাপ্ত সর্বাঙ্গ সুন্দর যুবক হিসেবেই মঙ্গলকবিরা লখিন্দরকে উপস্থিত করেছেন আমাদের সামনে। তাবে সেই লখিন্দর তো জানতে চাইতে পারেন কেন তিনি সুস্থতার সঙ্গে নিজের একান্ত নিজস্ব জীবনটি নির্বাহ করতে পারবেন না! মনসা পুজো করা বা না করা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। শিব পুজো নিয়েও নেই। তিনি ধর্মেও নেই, জিরাফেও নেই। পিতার মতো মনসার ঘট ভাঙাতে তাঁর কোনো রুচি নেই। অন্যদিকে সদাগরের ছেলে তিনি। তাই বাণিজ্য করতে যেতে হবে হয়ত। কিন্তু তা নিয়ে কোনো উদগ্র অপেক্ষা নেই। বেহুলাতে মোহিত হয়েছেন। বেহুলারও তাঁকে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। বরং ভালোই লেগেছে। বিবাহ হয়েছে। এইবার বয়সের ধর্ম এবং সংসার ধর্ম পালন করবেন দু'জনে। এখানে অন্যের প্রবেশের সুযোগ নেই। কিন্তু কালের চক্রান্তে চাইলেই একটা নির্বিঘ্ন জীবন বেছে নেওয়া যাচ্ছে না।

বিবাহের প্রথম রাত। দুইজন নারী পুরুষ চিনে নেবেন নিজেদের। আসবেন অভূতপূর্ব কাছাকাছি। পৃথিবীর উপরেই সে রাত্রে রচিত হবে এক মায়ার আকাশ।

দুইজন বন্ধনহীন নারী পুরুষ উড়ে যাবেন সেই আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মতো। কিন্তু তেমন হল কোথায় লখিন্দরের জীবনে! আকাশে উড়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল লোহার চাদর ঢাকা নিশ্ছিদ্র বাসরঘরের গুমোট অন্ধকারে। মিলনের মুহূর্তগুলো দখল করে নিল নাগদংশনের কুণ্ডলিত ভয়। কিছুতেই স্বাভাবিক জীবনের ছাড়পত্র না পাওয়া যুবক লখিন্দর খেদের সঙ্গে বেহুলার কাছে জানাচ্ছেন :

নাই যদি ছড়ালেম জীবনের প্রথম রহস্য-উপাচারে,
রাত্রির রভসে, নিঃসার আবেশে, তবে
কেন এত সজ্জিত আনন্দ বাসরের।[১৯]

বাসরঘরের বাইরে ওঝার ভিড়। হেতালের লাঠি নিয়ে প্রহরারত মনসা বিদ্বেষী পিতা। সঙ্গে মনসার অনুচরদের হিস হিস ধ্বনির মধ্যে ছিদ্র সন্ধানের উদগ্রতা। এ কখনো মিলনের রাত হতে পারে না। হতে পারে না স্বাভাবিক জীবন। লখিন্দরের মনে হয় তিনি যেন অকারণ যুদ্ধের মধ্যে উলুখাগড়ার মতো উপস্থিত হয়েছেন। এই জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার থেকে অনেক শান্তির মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। এও এক প্রতিবাদ। নাগদংশনে লখিন্দরের মৃত্যু সেক্ষেত্রে আর হত্যা থাকে না, আত্মহত্যা হয়ে যায়। আর আত্মহত্যা তো সামাজিক প্রতিবাদের বহু প্রাচীন স্বীকৃত পথ। যখন সময় ও সমাজকে বদলানো যাচ্ছে না, তখন সেই বিক্ষোভ বিক্ষুব্ধের দিকে ঘুরে যেতে পারে। তাঁর আত্মঘাতের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সেই আত্মঘাতটাও প্রতিবাদের একটা পথ। বিচিত্র প্রতিবাদী পথের মধ্যে একটা। লখিন্দরের বেছে নেওয়া ব্যতিক্রমী এক প্রেমিকের প্রতিবাদ। সুস্থতার সঙ্গে বাঁচতে চাওয়া একজন যুবকের প্রতিবাদ। জিয়া হায়দার সেই প্রতিবাদী লখিন্দরকে ভাষা দিলেন।

প্রেমের মধ্যে, স্বজনের মধ্যে বাঁচতে চাওয়া লখিন্দর এক অকারণ সমসাময়িক চক্রান্তে সব কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন। এক অপচয়িত যুবমনের বিক্ষুব্ধ আবেগ থেকে মৃত্যুকে বরণ করে বিদায় নিয়েছেন লখিন্দর। রেখে গেছেন যুগে যুগে স্বেচ্ছামৃত্যুর প্রকম্পিত উৎসার :

যদি তুমি প্রেম দিয়ে অলস স্বর্গের সিংহাসন
এই ধূলিধূসরিত মাটিতে নামাও,
মৃত্যুকে বরণ করবো যুগে যুগে, যেহেতু জীবন –
বরদা তোমার প্রেম, তুমিই, বেহুলা।[২০]

বেহুলার প্রেমের মধ্যেই জীবনের সারবত্তা সন্ধান করে সব কিছুকে অস্বীকার করা, নাকচ করা, চলমান সময়ের স্রোতের থেকে দূরত্ব তৈরি করা, জীবনের অগ্র-

পশ্চাৎ সমস্ত কিছুকে অপ্রয়োজনীয় হিসেবে নির্দিষ্ট করাও একরকম প্রতিবাদ হতে পারে। আর যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের উল্লেখ করতেই হয় মনসামঙ্গলের সেই নীরব প্রতিবাদ সরব হয়েছে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'বেহুলা' কবিতায় লখিন্দরের উচ্চারণে :

তোমার ভেলায় যদি নিলে
নাচো জল, নাচো রক্ত, বেহুলা আমার।[২১]

জল আর রক্তের সঙ্গে বেহুলাকে মিশিয়ে নিয়ে জগৎকে আর সময়ের চক্রান্তকে একেবারে নাকচ করে দিয়েছেন লখিন্দর। প্রেম আর প্রতিবাদের এই মিশ্রণ শুধু লখিন্দরের মধ্যেই ভাষা পেয়েছে এমন নয়। বেহুলাও লখিন্দরকে ভালোবেসেছেন। লখিন্দরকে নিয়ে একটা স্বপ্নের উড়ান তো বেহুলারও স্বপ্ন ছিল। সমসাময়িক বিষাক্ত চক্রান্তে সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তবু বেহুলা স্বপ্ন দেখার অধিকার ছাড়তে চাননি। ছাড়তে চাননি সে স্বপ্ন পূরণের প্রত্যাশা। সেকারণেই নিজের মৃত সোহাগকে ভেলায় চড়িয়ে উপনীত হয়েছেন সেই রাজ্যে, সেই কালের উত্তরপর্বে, যেখান থেকে ছিনিয়ে আনা যায় স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন পূরণ করার অধিকার। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লখিন্দর' কাব্যগ্রন্থের 'বেহুলা' কবিতায় আমরা সেই বেহুলাকে পাই, যাঁর মধ্যে প্রেম প্রত্যয় আর প্রতিবাদ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সেই সমাপতন থেকেই বেহুলা উচ্চারণ করেন :

গান দেব, জ্বলব, কিন্তু হব না অঙ্গার;
সে জাগবে, জাগবেই, লখিন্দর সে আমার।[২২]

মনসামঙ্গল কাব্য উদ্দেশ্যগত ভাবেই মনসার পূজা প্রচারের কাব্য। সেখানে কাব্য সৃজন ছিল গৌণ উদ্দেশ্য। কবিদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এক চমকপ্রদ কাহিনির অবতারণা করে একাধারে নিজের ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূরণ ও কবি যশপ্রাপ্তি। কিন্তু একালের কবিদের হাতে পড়ে সেই মনসামঙ্গল বারবার ভিন্ন অর্থবোধে উপনীত হয়েছে। মনসা প্রায় সর্বত্র তাঁর দৈবী মহিমা হারিয়ে পরিণত হয়েছেন এমন এক অভিপ্রায়ে, যাঁকে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রশক্তি বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি নিজের পুজো করাতে চান যে কোনো শর্তে। যেমন প্রতিটা রাষ্ট্রশক্তিই কামনা করে তাঁর শাসন এলাকায় তাঁরাই থাকুক, যাঁরা নিঃশর্ত ভজনা করবেন রাষ্ট্রের বিধাতার। তাঁর বিধানই প্রশ্নহীন ভাবে পালিত হবে রাষ্ট্রময়। সেটা না হলেই বেড়িয়ে আসবে রাষ্ট্রের দাঁত-নখ-শিং। রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি যাঁর হাতে রয়েছে, তিনি ছিঁড়ে ফেলতে চাইবেন, নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইবেন তাঁর বিধানের ও অনুশাসনের থেকে ভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করতে চাওয়া মানুষগুলিকে।

মনসামঙ্গলের মনসাও তো তেমনই অভিপ্রায় প্রদর্শন করেছেন। তাঁর পুজো করতেই হবে চাঁদ সদাগরকে। এক্ষেত্রে চাঁদ সদাগরের ভিন্ন কোনো ইচ্ছা যে থাকতে পারে, তা ভাবতে বা মানতে আগ্রহী নন মনসা। চাঁদ হলেন মনসার স্বার্থ পূরণের উপায়। ফলে সে উপায়কে বাধ্য ও বিধ্বস্ত করতে চেষ্টার কসুর করেননি মনসা। শেষ পর্যন্ত তাঁরই জয় ঘোষিত হয়েছে মঙ্গলকবিদের সৌজন্যে। একটা অন্যায় ও অসম যুদ্ধে হার না মেনে সামনাসামনি হওয়া মানুষ চন্দ্রধরের জন্যে কাহিনির শেষে ক্ষতিপূরণ ও উপঢৌকন ছাড়া আর কোনো ভিন্ন রকমের নির্দেশিকা ভাবতে পারেননি মধ্যযুগের কবিরা। কাব্যের সেই ক্ষতিপূরণ করেছেন একালের কবিরা। তাঁরা মেনে নিতে পারেননি লখিন্দরের কুয়াশাচ্ছন্নতা। মানতে পারেননি ধর্ষিতা বেহুলার হাসি মুখে শ্বশুরগৃহে সতী নামের মালা গলায় নিয়ে প্রত্যাবর্তন। মানতে পারেননি লখিন্দরের ভিক্ষালব্ধ জীবন নিয়ে এক অসহ্য উপায়ে নিজের প্রাণ ফিরে পাওয়ার ইতিহাস জানার পরেও স্ত্রীর পিছুপিছু পিতৃগৃহে ফিরে আসা। একালের কবিরা প্রশ্ন করেছেন মনসামঙ্গলকে, এ ভাবে ফিরে আসা যায়! ফিরে আসা সঙ্গত! সেই বিপরীত স্রোতের প্রশ্নমালাই প্রতিবাদ হয়ে ভাষা পেয়েছে চাঁদ সদাগর, লখিন্দর, বেহুলার কণ্ঠে। মূক প্রতিবাদের নীরব এলাকা মুখর হয়েছে। ক্ষমতার দম্ভে রাষ্ট্রশক্তির মতো ব্যবহার করতে থাকা মনসাকে শঙ্খ ঘোষের মতো একালের অভিভাবক স্থানীয় কবি তাঁর কবিতায় 'কানী' ব্যতীত অন্য কোনো সম্বোধন করে উঠতে পারেননি। এ হল শ্রেণি সচেতন কবিদলের পক্ষ থেকে শ্রেণিশোষক রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি কালের প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই বহুরৈখিক ও বহুমাত্রিক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে কখনো চাঁদ সদাগর, কখনো লখিন্দর, কখনো বেহুলাকে আশ্রয় করে। আর এভাবেই আদি পাঠের একের পর এক বিনির্মাণ ঘটেছে বাংলা কবিতার চালচিত্রে। পুনঃপঠিত হয়ে চলেছে মনসামঙ্গল।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করেছি একালের কবিরা ক্ষমতার বিপক্ষে লড়াইকে মনসামঙ্গলের আবহে কীভাবে নতুন পথে পড়েছেন। মনসামঙ্গলে মনসা নিঃসন্দেহেই একটি শক্তিকেন্দ্র। এই শক্তি বা ক্ষমতার একটা ভাষা আছে। একটা সাধারণ চরিত্র রয়েছে। সে অপছন্দের অন্য কোনো স্বরকে মুক্তি দিতে অনাগ্রহী। যে কোনো ধরণের বিরুদ্ধকণ্ঠকে ধ্বংস করতে তার নিষ্ঠুরতা সীমাহীন হয়ে উঠতে পারে। অর্থনৈতিক ভাবে উচ্চতর পাটাতনে অবস্থান করলে, রাষ্ট্রশক্তির কোনোরকম কক্ষে অবাধ অধিকার নির্মিত হলে সেই শক্তির ভাষা শোনা যায় একালেও। রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায়

পূরণের জন্য দমন-পীড়নে মনসার নির্মমতার উত্তরাধিকার প্রত্যক্ষ করতেই পারেন একালের সচেতন কবি। আবার সামূহিক অত্যাচারের মধ্যেও তো ইতিহাস চিরকাল জাগ্রত চেতনার বিপ্লবী নির্ঘোষেরই পক্ষপাত করেছে, একথাও ভুলতে পারেন না আধুনিক বাংলা কবিতার স্রষ্টারা। অর্থাৎ ক্ষমতার মধ্যে মনসা, আর তার বিপক্ষে লড়াইয়ের মধ্যে আবহমানের মানুষকে বারবার সন্ধান করেছেন কবিরা। পরিচ্ছেদটিতে তার একটা নৈর্ব্যক্তিক পর্যালোচনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

তৃ তী য় প রি চ্ছে দ

অজৈবের জৈব স্বপ্নবিলাস : কবিতায় সপ্তডিঙা মধুকর ও অন্যান্য

পারসনিফিকেশন নামক বিষয়টি সাহিত্যে বেশ প্রাচীন। অজৈব বস্তুর মধ্যে জৈব গুণ আরোপ করে বিশ্ব সাহিত্যে বহুমাত্রিক সৃজন হয়েছে, এখনো হয়ে চলেছে। শুধু ঈশপের গল্প বা ফেয়ারি টেল বা ফেবল জাতীয় সৃজনের মধ্যে নয়, অনেক সিরিয়াস সাহিত্যেও এই পারসনিফিকেশনের নানা মাত্রা লক্ষ্য করেছি আমরা। অজৈব বস্তুর মূক বুকে কান পেতে বিশ্ব সাহিত্যের স্রষ্টারা বারবার শোনার চেষ্টা করেছেন তাদের অন্তরের কথা। সাহিত্যে বাক দান করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। আমরা তো এটা মেনেই নিয়েছি যে, প্রাকৃত সত্য আর সাহিত্যের সত্য এক হয় না। এক রেখা ধরেও চলে না। সাহিত্যে চলে এক সৃজনশীল স্বজ্ঞার প্রণোদনা। প্রকরণবাদীরা যাকে সাহিত্য সৃজনের ইমপিডেড ফর্ম বলেছেন, তা বাস্তবের কানুন মেনে অগ্রসর হয় না বহু ক্ষেত্রেই। বিশেষত সাহিত্যে বাস্তব আর সত্যকে এক করার রীতি নেই। সাহিত্যের মধ্যে যেখানে শাশ্বতের সাধনা চলে, সেখানে বাস্তব সাময়িকতা আক্রান্ত হয়ে কালের সীমা অতিক্রম করতে অপারগ হয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এই অজৈব বস্তুর মধ্যে জৈব গুণ আরোপ করার একাধিক দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সে সমস্ত আয়োজন নিছক উপস্থাপনের দিকে লক্ষ রেখে সাহিত্যবস্তুর মধ্যে চমৎকারিত্ব বিধানের জন্যে। সমুদ্র, বায়ু, ডিঙার হাল ক্ষেত্র বিশেষে মনুষ্যচিত আচরণ করেছে। এক আধিভৌতিক চমক সৃষ্টি করে পাঠক ও শ্রোতার মধ্যে উৎকণ্ঠা আর আগ্রহ বিধান ছাড়া আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য তার মধ্যে ছিল না। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য গুণ আরোপ করা, তাদের দিয়ে কথা বলানো, সিদ্ধান্ত নেওয়ানো, তাদের রূপ পরিগ্রহণ ও রূপান্তরণের বহুতর দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের সাহিত্যে আছে। সাদা কাক, মাছ, সাপ, বাঘ কথা বলেছে, কেঁদেছে, বিচার

করেছে, হেসেছে স্থানে স্থানে। কিন্তু সেই সব আয়োজনও পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যেরই উপায় স্বরূপ পাঠের মধ্যে সমীকৃত হয়েছিল। একালের কবিরা সেসব চমকের উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে অজৈব বস্তুর মধ্যে আপন সৃজনী স্বজ্ঞা নিয়ে বাসা বেঁধেছেন। মনসামঙ্গলের অকথিত সমান্তরাল একাধিক ভাষ্য নির্মিত হয়েছে বিনির্মাণের পথ ধরে।

কবি কৃষ্ণা বসুর 'চাঁদ বণিকের ডিঙা' কবিতাতে আমরা দেখলাম চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙার মধ্যে একটিতে ঘটিয়েছেন জৈব অভিব্যক্তি। এর আগে ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙার নামগুলি পেয়েছিলাম। এক ঐতিহাসিক আবহের মধ্যে অমিয়ভূষণ বিস্তার করেছিলেন তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো জৈব অভিব্যক্তি সংযোজন করেননি অমিয়ভূষণ। কবি কৃষ্ণা বসু কেবলমাত্র নামহীন একটি ডিঙার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। কিন্তু সেই ডিঙার মধ্যে প্রাণ, স্বপ্ন, আশা, হতাশা সঞ্চার করে মনসামঙ্গলের কাঠামো ভেঙে অসম্ভব বলে প্রতিভাত হতে পারে, এমন পাঠ নির্মাণ করলেন কবি।

বাঙালির ইতিহাসের সঙ্গে বাণিজ্য যাত্রার একটা প্রাচীন সংযোগ আছে। সেই সংযোগ একেবারে খ্রিস্টজন্মের কয়েক হাজার বছর আগে থেকে প্রমাণ বহন করে চলেছে। বর্ধমানে পাণ্ডু রাজার যে ঢিবি আবিষ্কার হয়েছে তা প্রায় চার হাজার বছরের পুরাতন বলে মত দিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকগন। সেখানে খননকার্য চালিয়ে সুদূর ক্রীট প্রদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেছে এই বাংলার। মধ্যপ্রাচ্য থেকে পারস্য, সাইপ্রাস, সিংহল, ইন্দোচিন এমন কি গ্রিস বা রোমের সঙ্গেও বাংলার সমুদ্র পথে বাণিজ্যের বহুতর প্রমাণ আমরা পাচ্ছি। বাংলায় গন্ধবণিক নামে আজও যে সমৃদ্ধ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে, তাঁদের পূর্বসূরিরাই এক্ষেত্রে সামনের সারিতে অবস্থান করতেন। গন্ধবণিক মহাসভার সিদ্ধান্ত, চাঁদ বণিক একজন পুরোধা স্থানীয় গন্ধবণিক ছিলেন। মূলত সুগন্ধী, মশলা, বনৌষধি, মধু এবং পোস্ত বাংলা থেকে রফতানি করতেন বণিকরা। সুগন্ধীর বাণিজ্যের কারণে এই বণিকরা কালান্তরে গন্ধবণিক নামে আখ্যাত হন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল অনুসরণ করলে আমরা জানতে পারি চাঁদের বাণিজ্য যাত্রা ছিল 'দক্ষিণ পাটনে'। সম্ভবত সিংহল যাত্রার প্রবন্ধ করেছিলেন চাঁদ সদাগর। কারণ মঙ্গলকাব্যগুলিতে সিংহল বাণিজ্য যাত্রার প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। এসেছে সিংহল রাজার কথাও। এই বাণিজ্যপথ চাঁদের চেনা পথ। উৎফুল্ল সমৃদ্ধ জলপথ বাণিজ্য। ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় ঐতিহ্যশালী সেই বাণিজ্য যাত্রায় চাঁদের প্রধান পণ্য ছিল পোস্ত :

মতিগতি মনসার ঘা মারিয়া পদের
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে।।
কান্দয়ে বাঙ্গাল হইনু কাঙ্গাল
ভেসে গেল পোস্তের হোলা।[২৩]

বণিকদের বাণিজ্যযাত্রার প্রধান সহায় ছিল সুবিশাল নৌবহর। একাধিক ছোট বড় মালবাহী পালতোলা বজরায় সেজে উঠত সেই নৌসজ্জা। মধুকর ডিঙা চাঁদ বণিকের সাত সুবিশাল ডিঙা দিয়ে নির্মিত নৌবহরের অন্যতম। সেই ডিঙা, যা কালীদহে সলিল সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছিল মনসার চক্রান্তে, তার পূর্বে বহু বন্দরে ঠেকেছে। দীর্ঘকাল সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক বিকিকিনির সাক্ষী থেকেছে। সদর্পে ভেঙেছে সাগরের অত্যুঙ্গ ঢেউ। আকাশোফোঁড়া পাল তুলে স্রোতের শাসন অমান্য করে ছুটে গেছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে। সেই মধুকর ডিঙার সলিল সমাধি ঘটেছে এক কৃত্রিম চক্রান্তের কারণে। ভেসে গেছে পণ্য। ভেসে গেছে মাঝি-মল্লার দল। ভেসে গেছে কর্ণধার চাঁদ বণিক। কে কোথায় আছেন তা জানার কথা নয় মধুকরের। কিন্তু যদি এই অবস্থা থেকেই শুরু হত মধুকরের কথা বলা! যদি শুরু হতে পারত তার চেতনার বহিঃপ্রকাশ! যদি সঞ্চারিত হতে পারত জৈব গুণাগুণ! সেই কল্পনাতীত সম্ভাবনাকে সঙ্গী করেই কবি কৃষ্ণা বসু নির্মাণ করতে থাকেন তাঁর কবিতার প্রতিবেদন।

চাঁদ বণিকের ডিঙা এখন জলের নিচে নিঃসঙ্গ দিন যাপন করে আর স্মরণ করে পুরাতন গৌরবের দিনগুলো। কবিতার প্রথমেই আমরা পরিচিত হই ডিঙাটির পরিচিতি উচ্চারণে :

আমি চাঁদ বণিকের ডিঙা
নদীর নির্জনে ডুবে আছি বহুদিন।
সারা গায়ে শ্যাওলা ধরেছে,
চুপ করে পড়ে থাকি ঠাণ্ডা কালো জলের গভীরে,
মাছেরা ঠোক্কর দেয়, ডিম পাড়ে, ছানাপোনা নিয়ে ঘর বাঁধে,
বণিকের নৌকাখানি থিতু হয়ে বসে থাকি জলের কালোয়।[২৪]

চাঁদ বণিকের ডিঙাটির এই পরিচিতি আমরা দুই ভাবে নিতে পারি। প্রথমত ডিঙাটি একটা সমৃদ্ধ সময়ের স্মারক। সে একই সঙ্গে চম্পক নগরের সমৃদ্ধির সঙ্গী ও কারণ। তার বুক ভরা পণ্য বহনে সেই নগরে এসেছে সুখের খবর। বহু উজ্জ্বল জনপদের ছোঁয়া লেগেছে তার বৈঠায়। বহু জোয়ান মাঝি-মল্লার হাসি-কান্না-ঘামের অতিবাহন রয়ে গেছে তার স্মৃতির পাটাতনে। সে সব এখন অতীত। এখন শুধু নির্বাক

প্রহর মেপে চলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তার। এক ক্ষমাহীন চক্রান্তে তাকে ব্রাত্য হয়ে যেতে হয়েছে চিরকালের মতো। আরও অনেক সমৃদ্ধ দেশান্তর দেখার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে তাকে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে যেমন ভাবে ধ্বংস হয়ে যায় অনেক স্বপ্ন সভ্যতার ইমারৎ, তেমনি ভাবে নিমজ্জিত ডিঙা সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাসের সত্যের।

কিন্তু যখন আমরা তার পরিচয়দানের মধ্যে 'মাছেরা ঠোক্কর দেয়', 'ডিম পাড়ে' প্রভৃতি আক্ষেপ গুলিতে সতর্ক দৃষ্টি দিই, তখন আমাদের মধ্যে এক অন্য অর্থনৈতিক রূপান্তরের বোধ জন্ম নেয়, ইতিহাস যার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। মনে হয় এই ডিঙা বাংলার সেই ভগ্ন সামন্ততন্ত্রের প্রতীক, যার কথা বহু আঙ্গিকে গভীর দরদ দিয়ে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে গেছেন তাঁর সৃজনগুলিতে। শ্যাওলা মেখে বসে থাকা চাঁদ বণিকের ডিঙা সেই ভগ্ন জমিদারতন্ত্রের মানসিকতা নিয়ে নির্জনে বসে রয়েছে, যেখানে স্বাভাবিক জলচরদের স্পর্শ তার কাছে 'ঠোক্কর'-এর মতো বোধ হয়। তাদের চলমানতায়, স্বাভাবিক প্রজননের মধ্যে নিজের চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থাটা আরও অসহ্য ঠেকে। যে প্রতাপ নিয়ে একদিন সাগরের জল কেটে চলত সে, তার প্রাবল্যে ধারে কাছে ঘেঁষত না অকিঞ্চিৎকর মাছ অথবা তুচ্ছ সামুদ্রিক জীবগুলি। আজ তারাই তার জলের উপর নিয়ন্ত্রণহীনতার সুযোগ নিয়ে তারই মধ্যে 'ছানাপোনা নিয়ে ঘর বাঁধে'। তার এই আক্ষেপের ভাষা আমাদের কোথাও সম্পন্ন কবির শ্রেণিদরদ বলে মনে হয়। এই স্থবিরতা নিশ্চিৎ অথচ অসহনীয় ভাবে তুলে ধরার মধ্যে কোথাও যেন কবি সেই শ্রেণিদাক্ষিণ্য দেখালেন, যা ইতোমধ্যে আমরা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তারাশঙ্করের মধ্যে পেয়ে অভ্যস্ত।

আমাদের কাছে অভিব্যক্ত কোনো শব্দই বাহুল্য নয়। কবি যদি মনসামঙ্গলের পাঠে অনুক্ত ডিঙার আক্ষেপের কথা শুনতে পারেন, বুনতে পারেন তাকে নতুন ভাবে কবিতার প্রতিবেদনে, তবে সেই আক্ষেপের মধ্যে ভাঙা-ছেঁড়া সামন্ততন্ত্রের অনুক্ত উন্নাসিকতার বুকে আমরাও কান পাততে পারি। বিনির্মাণের শর্তও তো তাই। কেবল ভাঙা আর ভাঙা। একটা প্রতিবেদন গড়ে ওঠার পরমুহূর্তেই আবার তাকে ভাঙার জন্যে তৈরি হয়ে যাওয়া।

নিমজ্জিত ডিঙার চেতনা প্রবাহে ফিরে ফিরে আসে অতীত গৌরবের নানা টুকরো চিত্র। মাথার উপরে কম্পমান জলস্রোত তাকে টেনে নিয়ে যায় সেই নিকট অতীতে, যেখানে তার উদ্ধত পালের রবরবায় মুগ্ধ হত বন্দরের চোখগুলো। ডিঙা বলে চলে :

মাঝে মাঝে তীব্র ইচ্ছা নাচায় তরঙ্গ, জলকণা,

দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসা ঢাকের গর্জন।
ইচ্ছে হয় ভেসে উঠি শরতের হিরণ রোদ্দুরে,
সাদা গরিমার পাল তুলে ভেসে যেতে ইচ্ছে হয়
ব্রহ্মদেশে জম্বুদ্বীপে শ্রীলঙ্কার বন্দরে বন্দরে।[২৫]

এখানে ডিঙার বয়ানে প্রযুক্ত 'সাদা গরিমা' শব্দবন্ধটিকে আমরা কোনো ভাবেই একান্ত শ্রেণিপরিচিতিশূন্য কথার কথা ভাবতে ইচ্ছুক নই। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার ইতিহাসটুকু স্মরণ করলে আমরা বলতেই পারি বন্দরপথে 'সাদা গরিমা'-র শরীরেই সেই বণিকদলের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল উপনিবেশগুলোতে। আমাদের প্রশ্ন জাগে ডিঙার স্মৃতি-সত্তায় কি সেই ঔপনিবেশিক ইতিহাসেরও পদাবলী লগ্ন হয়ে আছে!

আর্থিক দিক থেকে উচ্চকটিতে থাকা একজন মানুষের সেই শ্রেণিগত অবস্থানে থাকার সঙ্গেই লগ্ন হয়ে থাকে শোষণের ইতিহাস। আমরা বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল যখন পাঠ করি, তখন কবি যতই কৌতুক করে বর্ণনা করুন না কেন, 'বস্তুবদল পালা'-তে আমরা দেখতে পাই বাণিজ্যকালে চাঁদ সদাগর সহচর ধনার সহযোগিতায় ক্রেতা রাজাকে এক প্রকার লুঠ করে চলেছেন। যা দিচ্ছেন, সমস্ত ক্ষেত্রে তার দেড় বা তিন গুণ হরণ করছেন। ছলনার দ্বারা একপ্রকার নিঃস্ব করে ছাড়ছেন পরদেশী রাজাকে। সেই শোষণ করে, হরণ করে আনা সম্পত্তি রাশিকৃত করা হচ্ছে ডিঙাতে। অন্যায় সম্পদে সমৃদ্ধ ডিঙা। সেই হরণের গৌরব, শোষণের গৌরব 'সাদা গরিমার পাল'-এ লেপ্টে নিয়ে ডিঙা চলে বন্দর থেকে বন্দরে। কালীদহে না নিমজ্জিত হলে সে ডিঙার হাসি চওড়া হত সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ডিঙার জবানি শুনতে শুনতে তার কষ্টে লীন হয়ে আমরা যেন তার শোষক অনুষঙ্গ না ভুলে যাই। তার মধ্যে যে সামন্ততন্ত্রের উন্নাসিকতার বিষ চূড়ান্ত মাত্রায় রয়েছে, তা আমরা অনুধাবন করতে পারি চাঁদ বণিকের কণ্ঠ আর মাঝিদের গায়ের গন্ধের মধ্যে পার্থক্য আর পক্ষপাতিত্ব করার মধ্যে। অনুধাবন করি বুকে বাণিজ্যলগ্ন শোষণলব্ধ সম্পদ ধারণ করার মধ্যে যে সুখের প্রকাশ, তার মধ্যে :

শরীরে স্বর্ণের ভাণ্ড, তিসি, মোম, লাক্ষারস, মধু,
রেশম বস্ত্রের বিভা, দারুচিনি, কর্পূরের ভাঁড়,
মাঝি-মল্লাদের গায়ের আমিষ গন্ধ,
চাঁদ বণিকের জেদী কণ্ঠস্বর সঙ্গে নিয়ে ভাসি
নদীর নরমন ছেড়ে সমুদ্রের নুনে।[২৬]

সাধারণ, বৃহত্তর জনমানুষের যে জীবন, যে প্রয়োজন, তার সঙ্গে কোনোদিন কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি এই ডিঙার। তাই স্বেদ-ঘর্মের মাঝি-মল্লাদের দেহের গন্ধ তার আঁশটে লাগে। সেই মাঝি-মল্লাদের শ্রমশোষক চাঁদ সদাগরের কণ্ঠস্বর জেদী মনে হয়। তার শরীরে বাহিত স্বর্ণভাণ্ডের উপর সেই আঁশটে গন্ধের মাঝি-মল্লাদের কোনো অধিকার যে কোনো কালে বিন্দুমাত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না, বা বিবেচিতও হবে না, সে কথা বোঝার মতো কোনো সংবেদনশীলতা বণিকের ডিঙার নেই। জলের উপরে যখন সে সাদা গরিমা তুলে ধরে বাহিত হত, তখন মাঝি-মল্লাদের গায়ের গন্ধ 'আমিষ' লেগেছে। আর এখন জলের নিচে আমিষ মাছেদের স্পর্শে 'ঠোক্কর' লাগে। এই সমাপতন কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? একান্ত কাকতালীয় বলতে পারি বিজ্ঞানমনস্ক সাহিত্য সমালোচনায়? যদি তা না পারি, তবে এই ডিঙাকে সব দিক থেকেই এক উন্নাসিক ভগ্নদশার সামন্তপ্রভুর দুঃসময়ের শরীরী প্রতিমা বলে আমরা নির্দিষ্ট করতেই পারি আপাতত।

'চাঁদ বণিকের ডিঙা' কবিতাটির প্রতিটি স্তবক একরকমের রেখার উপর দাঁড়িয়ে নেই। সেকারণেই আগের অনুচ্ছেদগুলিতে সেই ডিঙাকে ভগ্ন সামন্ততন্ত্রের প্রতীক হিসেবে আলোচনা করার পরেও শেষ পর্যন্ত আমাদের সুচিন্তিত ভাবেই 'আপাতত' শব্দটি উচ্চারণ করতে হয়েছে। কারণ কোনো একটা বিশ্বের একমাত্রিক নিদর্শন হিসেবে এই ডিঙাকে চিহ্নিত করায় অসুবিধা আছে। শুধুমাত্র ধীরোদ্দাত্ত পৌনঃপুনিকতায় নির্মিত করেননি কবি এই ডিঙার প্রতিবেদন। সেখান থেকে তাকে সংযুক্ত করেছেন বঙ্গদেশের সজল-শ্যামল প্রাত্যহিকতার সঙ্গেও। তাই সেই মাছের 'ঠোক্কর' আর মাঝি-মল্লার গায়ের আমিষ গন্ধ ভোগের ধীরোদ্ধত বয়ান ছাড়তেই আমরা দেখতে পাই এমন এক ডিঙা, যার ইদম্ (ফ্রয়েড যাকে বলেছেন Id) আর ইগোর (Ego) কোনো লড়াই নেই। সে মিলে যায় এক চিরাচরিত ডিঙার মর্মের মধ্যে :

আঃ, পালে এসে লেগেছে বাতাস,
শঙ্খচিল উড়ছে মাথায়, তীর ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে,
নীল নোনা ঢেউ এসে ভালোবেসে জড়ায় শরীর;
বাংলার গান গায় বড় মাঝিটির কালো ছেলে,
সে প্রথম এবারেই চলেছে সাগরে![২৭]

মানব মনের দুর্জ্ঞেয় নিরালোক নির্জ্ঞান স্তরের মধ্যে প্রতিনিয়ত অজস্র ভাবের উত্থান-পতন লেগেই থাকে। তার মধ্যে কিছু ভাবের শক্তি থাকে প্রবল। সেই ভাবগুলোই তার স্বজ্ঞান স্তরকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলে। সেই সজ্ঞান

কার্যকারিতা ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে 'লিবিডো' নাম পেয়েছে। তবে ফ্রয়েডের লিবিডোচিন্তা অনেকক্ষেত্রেই মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক পিউরিটার্ন মানসিকতার অভিব্যক্তি। অনেকক্ষেত্রেই তাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। পরবর্তী কালে ইয়ুং যাকে বলেছেন 'ডিজায়ার' বা সোপেন হাওয়ার যাকে 'উইল' বলেছেন বা হেনরি বের্গসঁর কথায় যাকে আমরা 'ইলান ভাইটাল' হিসেবে চিনেছি, তাদের প্রসার বা বিস্তার অনেক বেশি, অনেক বেশি লিঙ্গ নিরপেক্ষ, অনেক বেশি বিজ্ঞানমনস্ক। চাঁদ বণিকের ডিঙার নির্জ্ঞান স্তরে ঘটে চলা অহরহ অতীত বাণিজ্যের নানা অনুষঙ্গের ঝড় ক্রমে নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে তার স্থবির স্বজ্ঞান স্তরের যাবতীয় কার্যকারিতা। জলে নিমজ্জিত অবস্থাতেও সে শুনতে পায় ঢাকের বাদ্দি, নাকে পায় পুজোর গন্ধ। গুণতে পারে মাছের ডিম পাড়া বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হয়ে গ্রাম বাংলায় সমাগত হল শরৎকাল। জলের তলা থেকেই পায় শারদীয়ার পদধ্বনি। মন উত্তাল হয়ে ওঠে তার পুনরায় সুদিনের আশা আর বর্তমানের নৈরাশ্য ও সম্ভাবনাহীনতার দ্বন্দ্বে :

ঢাকের প্রখর শব্দ ভেসে আসে, জল ছুঁয়ে যায়,
গ্রাম বাংলায় পুজো এল।
নদীর নির্জনে ডুবে সব টের পাই,
কতদিন ডুবে আছি চাঁদ বণিকের ডিঙাখানি,
হায়, উড়তে ভাসতে ভুলে গেছি।[২৮]

ঠিক এই ভাবেই মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের একান্ত অচেতন ডিঙা, যে কেবল উল্লেখের মধ্যেই বারবার এসে তার কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ রেখেছিল, তাকে সচেতন চরিত্র করে তুলেছেন কবি কৃষ্ণা বসু। শুধু সচেতন করেননি, তার মধ্যে বুনে দিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা, বুনে দিয়েছেন নির্জ্ঞান থেকে স্বজ্ঞান আকাঙ্ক্ষায় যাতায়াত করা চেতনাপ্রবাহ। এক নতুন সম্ভাবনার জন্ম হয়েছে মনসামঙ্গলের সৃজনশীল অন্তর্ঘাতে। কিন্তু শুধু কবি কৃষ্ণা বসুর কবিতাতে নয়, বাংলার আরও অনেক কবিতায় টুকরো টাকরা ছড়িয়ে থাকা দৃষ্টান্ত আমাদের নজরে আসে, যেখানে মনসামঙ্গলের অনুষঙ্গে অজৈব বস্তুকে মধ্যে জৈব গুণান্বিত হতে দেখি। আমাদের আরও একবার স্মরণ করতে হয় কবি জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতার শেষ কয়েকটি চরণ :

...একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।[২৯]

বেহুলার মতো ট্রেডমার্ক বঙ্গনারীর আবহমানের নির্যাতনে বঙ্গ প্রকৃতির এই বেদনাতুর অভিব্যক্তি মনসামঙ্গলের কবির চিন্তায় আসেনি। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে এই রকমের কিছু অভিব্যক্তি মঙ্গলকবিরা নিঃসন্দেহে এঁকেছেন। আমরা দেখেছি একান্ত কর্তব্যবদ্ধ হয়ে লখিন্দরকে কালনাগিনী দংশন করলেও বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে সাপের চোখে জল এসেছে। দেখেছি স্বামীহারা নারীর ভাসানযাত্রার খবর তার পিতৃগৃহে পৌঁছে দিয়েছে ভেকধারী সাদা কাক। কিন্তু প্রকৃতির এই সমব্যথা মনসামঙ্গলে অমিল। এ একান্ত ভাবেই একালের রোমান্টিক কবির হাতে নির্মিত মনসামঙ্গলের পাঠভাঙা ফসল।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা পূর্বাপর আলোচিত জৈব বস্তুর আলোচনা থেকে বেরিয়ে এসে মনসামঙ্গলের মধ্যে যে সমস্ত অজৈব বস্তু ছিল, সেগুলির মধ্যে একালের কবিরা কীভাবে বিনির্মাণ ঘটালেন, তা দেখার চেষ্টা করেছি। আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি বিনির্মাণে একটা আপাত অতীব তুচ্ছ শব্দ বা আপাত তুচ্ছ অনালোকিত বস্তু, কোনোটাই ব্রাত্য থাকতে পারে না। বরং সেগুলিই কালক্রমে অধিক প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে পারে। চাঁদ সদাগর আসলে সমুদ্রপথে আমদানি-রফতানির ব্যবসায়ী। অথচ এক্ষেত্রে প্রধান নির্ভরযোগ্য বস্তু যে ডিঙাসমূহ, সেদিকে মনসামঙ্গলের কবিরা নানা সঙ্গত কারণেই অধিক আলো ফেলেননি। তাদের নাম ও রূপ বর্ণনা করেই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন। একালের কবি মনসামঙ্গলের অজৈব বস্তুতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে পথ ধরেই মনসামঙ্গলের এক না-বলা পাঠ নির্মিত হয়েছে। আমরা সেদিকেই মনোনিবেশ করেছি।

সূত্র ও টীকা

১. Derrida, Jacques, 2002, *Of Grammatology*, The End of the Book and the Beginning of Writing, Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, P. 11

২. দাশ, জীবনানন্দ, ২০০১, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, ভারবি, পৃ. ৪১

৩. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, ১৯৮০, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩২

৪. হুদা, মুহম্মদ নূরুল, ২০১২, *বেহুলার শাড়ি*, ঢাকা, সমাবেশ, পৃ. ৯

৫. তদেব, পৃ. ৭

৬. তদেব, পৃ. ২৩

৭. তদেব, পৃ. ৬৩

৮. দেব, সব্যসাচী (সম্পা:), ২০০৪, বীরেন্দ্রসমগ্র—১, কলকাতা, অনুষ্টুপ, পৃ. ১৪৮

৯. তদেব, পৃ. ২৪

১০. মিত্র, অরুণ, ২০০২, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২০৬

১১. তদেব, পৃ. ২০৬

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা:), ১৯৭৬, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, ভারবি, পৃ. ১৪২

১৩. দে, বিষ্ণু, ১৪১৪, কবিতা সমগ্র—২, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১৩১

১৪. কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার, ১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, নভেম্বর ২০০১, পৃ. ১২-১৩

১৫. ঘোষ, শঙ্খ, ২০১১, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১২৫

১৬. তদেব, পৃ. ১২৫

১৭. তদেব, পৃ. ১২৬

১৮. তদেব, পৃ. ১২৬

১৯. হায়দার, দাউদ (সম্পা:), ২০০৪, বাংলাদেশের কবিতা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, পৃ. ১১৫

২০. তদেব, পৃ. ১১৬

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা:), ১৯৭৬, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, ভারবি, পৃ. ১৪২

২২. দেব, সব্যসাচী (সম্পা:), ২০০৪, বীরেন্দ্রসমগ্র—১, কলকাতা, অনুষ্টুপ, পৃ. ১৪৮

২৩. ভট্টাচার্য, শ্রীবিজনবিহারী (সম্পা:), ২০১১, *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল,* দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ৪

২৪. একালের কবিতা সঞ্চয়ন, ২০০৯, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৯৯

২৫. তদেব, পৃ. ১৯৯

২৬. তদেব, পৃ. ১৯৯

২৭. তদেব, পৃ. ১৯৯

২৮. তদেব, পৃ. ১৯৯

২৯. দাশ, জীবনানন্দ, ২০০১, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, ভারবি, পৃ. ৪১